
বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
www.parwana.net
নভেম্বর ◆ ২০২৪

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ১১তম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৪ ♦ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১ ♦ রবী.সানী-জমা.আউয়াল ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

প্রবন্ধ
হুযুর ﷺ এর পবিত্র সুন্দর আকৃতি ও আচার আচরণ/মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার ০৭
নবীগণ নিষ্পাপ/মুহাম্মাদ বদরুজ্জামান রিয়াদ ১০
ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে আযমতে রাসূল ﷺ/মুহাম্মাদ সায়ীদ ১৫

ইতিহাস-ঐতিহ্য
ভূতখানা থেকে বেরিয়ে এল কাবার প্রহরী/মাওলানা নজমুদ্দীন চৌধুরী ১৮

সাহাবা
হযরত উমর (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ২১

আউলিয়া
বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.)/আব্দুল্লাহ যোবায়ের ২৮

আন্তর্জাতিক
সিনওয়ারের সিংহাসন/মুহাম্মাদ বিন নূর ৩১

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩৩
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৪
এক নজরে গতমাস ৩৭
কবিতা ৩৯
আবাবীল ফৌজ ৪০
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

কোটা সংস্কার আন্দোলন একসময় ছাত্র-জনতার বিশাল আন্দোলনে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে নতুন এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিপ্লবের তোপের মুখে মারাত্মকভাবে পতন হয় বিগত সরকারের। দেশের মানুষের শান্তিপূর্ণ বসবাস ও দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। দায়িত্ব নেয়ার প্রায় তিনমাস অতিবাহিত হলো। এই তিনমাসে দেশের মানুষের কী কী প্রত্যাশা পূরণ হলো তা নিয়ে ইতোমধ্যে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। মোটাদাগে বললে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল হয়নি। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই সচিবালয় ঘেরাও হচ্ছে। সিন্ডিকেটগুলো আগের মতোই যথাস্থানে বিদ্যমান। নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। ফলে, কমছেই না জনদুর্ভোগ। বিদ্যুতের অনেক গ্রাহক ভূতুড়ে বিলের অভিযোগ করেছেন, যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অনেকেই বলছেন, বিগত স্বৈরাচার সরকারের আমলেও হুট করে এতো বিদ্যুৎ বিল কখনো আসেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে চলছে বর্তমান সরকারের এক ধরনের টানাপোড়েন। নির্বাচন কবে হবে না হবে এসম্পর্কে আসছে না কোনো স্পষ্ট বিবৃতি। ইদানীং আবার রাষ্ট্রপতির অপসারণের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাষ্ট্র মেরামতের কাজ অনেকটা কচ্চপের গতিতে এগুচ্ছে। ফলত, জনগণ যত দ্রুত রাষ্ট্র পুনর্গঠনের আশা করেছিল ততটা দ্রুত কাজ হচ্ছে না। একথা মানতে হবে যে, বর্তমান সরকার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেছেন কিংবা ব্যর্থ হচ্ছেন। বিলম্বিত সিদ্ধান্ত অথবা সিদ্ধান্তহীনতার কারণে জনগণের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জানমালেরও ক্ষতি হচ্ছে। লুটপাট, ছিনতাই, ভাঙচুর, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, মামালার ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি-সহ জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নানান ঘটনা ঘটছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী দেশের মানুষের মূল প্রত্যাশা ছিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি দুর্নীতিমুক্ত, সুশৃঙ্খল সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্র। বর্তমান সরকারের উচিত দেশের মানুষের এই প্রত্যাশাকে এখনো প্রধান এজেন্ডা হিসেবে আমলে নিয়ে কাজ করা। পাশাপাশি রাষ্ট্র সংস্কারকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা। ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছেন, কাজের অগ্রগতির জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিশন গঠন করা হোক। দেশের সাধারণ মানুষ, এমনকি সব রাজনৈতিক দল সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা ও সময় দিতে প্রস্তুত থাকবে যাতে করে সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন, সকল প্রকার সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে সরকারি বিমান, রেল ও অন্যান্য যানবাহনের টিকিট সহজলভ্য করে সংস্থাগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলার এখনই সময়। বর্ষার পূর্বে রাস্তাঘাট সংস্কার; রাস্তাঘাট সংস্কারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত দুর্নীতি ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার রোধ করে টেকসই উন্নয়নের মডেল স্থাপনকে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে। সর্বোপরি, জনগণের স্বার্থকে বড় করে দেখে সেগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে সময়মতো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়া এখন সময়ের দাবি। রাজনৈতিক গোলকধাঁধায় পড়ে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি নিজেদের চেয়ার দীর্ঘমেয়াদি করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয় তাহলে বিগত স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের কোনো দাম থাকবে না।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ–

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কাবাঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে সাঈ করলে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বত:স্ফুর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৮)

তাফসীর:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْم

الصفا শব্দটি صفاة শব্দের বহুবচন। আবার কেউ বলেন صفا একবচন, এর দ্বিবচন হচ্ছে صفوان এবং বহুবচন হচ্ছে اصفاء–صفيا صفيا অর্থ প্রকান্ড পাথর খন্ড। আর মারওয়া শব্দের অর্থ ছোট ছোট পাথর, এর جمع قلت হয় مروات।[১]

তা হারাম শরীফের দুটি পাহাড়ের নাম। এ আয়াতে صفا ও مروة দ্বারা ঐ দুটি পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। তাই الف لام আনা হয়েছে যেন নির্দিষ্ট ঐ পাহাড়দ্বয় বুঝা যায়।[২]

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। এ দুপাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ান আবশ্যক, যা হজ্জের আহকামের মধ্যে একটি হুকুম। আল্লাহ তাআলার দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এ দুপাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোর জন্য, যখন ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার কাছে مناسك الحج দেখানোর জন্য প্রার্থনা করছিলেন। এটা خبر হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা امر উদ্দেশ্য। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এভাবে বলেছিলেন- ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا -অতঃপর হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে নির্দেশ করেছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার জন্য। (সূরা নাহল-১২৩) এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমকে ইমাম নির্ধারণ করেছেন ঐসব লোকদের, যারা এর পরে দুনিয়াতে এসেছেন। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করা এবং সাঈ অর্থাৎ দৌড় যদি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হয় এবং مناسك الحج এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে একথা স্পষ্টতঃ বলতে হবে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ নির্দেশ মুতাবিক আমল করেছিলেন এবং পরবর্তী সকলের জন্য এটা আবশ্যকীয় হয়ে আছে। আমাদের নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতকে তাঁর অনুসরণ করার জন্য আদেশ করেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তদ্রুপ আমল করা সকলের উপর ওয়াজিব।[৩]

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

-যে ব্যক্তি হজ্জ করবে বা উমরা করবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা করতে আসবে সে সাফা ও মারওয়ায় যাবে।[৪]

হজ্জ আদায়কারীকে الحاج বলার কারণ হলো, হাজীগণ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে বাইতুল্লাহ শরীফের ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। অতঃপর আরাফায় অবস্থানের পর কুরবানীর দিন তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর মিনা থেকে আবার তাওয়াফে সদর এর উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ ফিরে যান। এভাবে বারবার কাবা শরীফের উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করার কারণে হাজীগণকে الحاج বলা হয়।[৫]

আর উমরা আদায়কারীকে المعتمر বলার কারণ, সে প্রথমে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে। এরপর যিয়ারত করে আবার ফিরে আসবে। আর কেবল একবার কোনো বস্তুর ইচ্ছা পোষণকারীকে معتمر বলা হয়। واعتمر অর্থাৎ বাইতুল্লাহর ইচ্ছা পোষণ করে।[৬]

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। এখন لَا جُنَاحَ শব্দ দ্বারা বুঝা গেলো সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করার অনুমতি রয়েছে। শুধু তাই না, এ তাওয়াফ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। لَا جُنَاحَ কেন বলা হয়েছে তার কারণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এভাবে- আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে সাফা এবং মারওয়া দু'পাহাড়ে দুটি মূর্তি ছিল এবং লোকেরা মূর্তির সম্মানে তাওয়াফ করত। উমরাতুল কাদার বছর সাহাবায়ে কিরাম বলতে লাগলেন আমরা কেন সাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করব, অথচ জাহিলী যুগে মানুষ দুটি দেবতার সম্মানে অনুরূপ করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে, তাই ইবাদাত হিসেবে অন্য কিছুকে সম্মান দেখানো জায়িয নেই। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো আল্লাহর شعار এর অন্তর্গত।[৭] এখানে তাওয়াফ শব্দটা এজন্য উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু আল্লাহ জানেন যে, যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা জানে কোন জিনিসের কথা বলা হয়েছে। কারণ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা ছাড়া অন্য কিছুকে তারা ইবাদত মনে করত না। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরা করবে সে যেন সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ করতে ভয় না করে এ আশংকায় যে, জাহিলী যুগের মানুষ পর্বতদ্বয়কে তাওয়াফ করত সেখানে থাকা দুটি মূর্তির কারণে। ভয় না করার কারণ, তারা এ কাজ করত কুফরী অবস্থায় আর তোমরা তাওয়াফ করছো ঈমানদার থাকাবস্থায়, রাসূল ﷺকে সত্যায়ন করতঃ এবং সর্বোপরি আমার নির্দেশের অনুগত হয়ে। অতএব সাফা ও মারওয়ার সাঈর মধ্যে কোনো গুনাহ নেই।[৮]

এখানে جُنَاحَ শব্দের অর্থ পাপ। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন فَلَا جُنَاحَ বলে আল্লাহ তাআলা একথা বুঝিয়েছেন সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই বরং তাওয়াফের জন্য পূণ্য দেওয়া হবে।[৯]

وعن الشعبي ان وثانا كان فى الجاهلية على الصفا يسمى اساف ووثانا على المروة يسمى نائلة

-হযরত শাবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে সাফা পাহাড়ের উপর একটি মূর্তি ছিল যার নাম ছিল 'আসাফ' এবং মারওয়া পাহাড়ে একটি মূর্তি ছিল এর নাম ছিল 'নায়িলা'। যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা হতো তখন এ মূর্তিদ্বয়কে স্পর্শ করা হতো। যখন ইসলামের যাত্রা হলো, তখন এ দু'মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হলো। মুসলমানরা বলতে লাগলো এ মূর্তি দু'টোর কারণেই সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা হতো, এ পাহাড় দু'টির তাওয়াফ আসলে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতীক হিসেবে নয়। তখন আল্লাহ তাআলা فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১০]

হযরত ইবন শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম فَلَا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ থেকে جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا সম্পর্কে আপনার কী মত? একটু বাড়িয়ে হযরত আয়িশা (রা.)-কে এ কথাও বললাম আল্লাহর কসম! সাফা এবং মারওয়া তাওয়াফ না করলে কারো কোনো গুনাহ হবে না। তখন হযরত আয়িশা রাগ করে বলেন, হে ভাগিনা! তুমি খুবই মন্দ কথা বলেছ। এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল আনসারদের উদ্দেশ্য করে। কারণ ইসলামের আগে ঐখানে মূর্তিপূজা হতো। তাই আনসাররা হযরত ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা কী সাফা এবং মারওয়ার তাওয়াফ করব? তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা মারওয়ার তাওয়াফের বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন, সুতরাং এটা কারো পরিত্যাগ করার অবকাশ নেই।[১১]

হযরত আবূ বকর ইবন আব্দুর রহমান (র.) বলেন, আমি জ্ঞানী লোকদের থেকে শুনেছি। তারা বলেন, যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আয়াত নাযিল হয়, তখন সাফা এবং মারওয়ায় তাওয়াফের আয়াত নাযিল হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করতাম। আল্লাহ বাইতুল্লাহর তাওয়াফের কথা বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার কথা বলেননি। এখন আমরা যদি সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ না করি তাহলে কোনো গুনাহ হবে কী? তখনই আল্লাহ তাআলা إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الاية আয়াত নাযিল করেন।

قال ابو بكر فاسمع ان هذه الآية نزلت في الفريقين كلها فيمن طاف وفيمن لم يطف

-হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, এ আয়াত তাওয়াফকারী ও তাওয়াফ বর্জনকারী উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।[১২]

এখন হযরত শাবী (রা.) এবং হযরত আয়িশা (রা.)-এর কোনো রিওয়ায়াত হতেই একথা প্রকাশ হয়নি যে, সাফা এবং মারওয়ার তাওয়াফ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিষেধ ছিল, তারপর আল্লাহ তাআলা সে প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন। বরং বুঝা যাচ্ছে এ প্রতিবন্ধকতা উল্লেখিত দু'দলের পক্ষ হতে ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের দ্বারা তা দূর করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে দৌড়া مناسك الحج অর্থাৎ হজ্জের আহকামের অন্তর্ভুক্ত। যা ছেড়ে দিলে কাযা করতে হবে। যেমন তাওয়াফ ছেড়ে দিলে কাযা করতে হয়। তারা আরও বলেন, দুটি তাওয়াফের প্রতি আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে তাওয়াফে বাইতুল্লাহ এবং তাওয়াফে সাফা এবং মারওয়া। অন্য একদল বলেন, সাঈ অর্থাৎ সাফা এবং মারওয়ার দৌড় ছেড়ে দিলে এর ফিদইয়া আদায় করলে হয়ে যাবে, কারণ এটা পাথর মারার মতো, যা ফিদইয়া দিলে আদায় হয়ে যায়। যার জন্য পুনরায় কাযা আদায় প্রয়োজন হয় না। অন্য একদল বলেন, সাঈ হলো অতিরিক্ত অর্থাৎ করলে ভালো, সাওয়াব পাওয়া যাবে, আবার না করলে কোনো গুনাহ হবে না। এখন যারা সাঈ করা ফরয বলেন- তাদের কথা অনুযায়ী, ফিদইয়া দিলেও তা পূর্ণ হবে না।[১৩]

যারা সাঈ করবে না, তাদেরকে পুনরায় তা করতে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে-

عن عائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله

অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জীবনের শপথ, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ করবে না তার হজ্জ হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, সাফা ও মারওয়ায় সাঈ আল্লাহ তাআলার স্মৃতি বা প্রতীকসমূহের মধ্য হতে অন্যতম।[১৪]

হযরত মালিক বিন আনাস (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সাঈ করতে ভুলে গিয়ে মক্কা হতে দূরে চলে গেল, সে যেন আবার ফিরে আসে এবং সাঈ করে। যদি এসময় সে স্ত্রী সহবাস করে নেয়, তাহলে তার উপর উমরা ও হাদী ওয়াজিব হবে।[১৫]

হযরত ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেল, তাঁকে অবশ্যই মক্কায় ফিরে এসে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করতে হবে, কারণ এর অন্য কোনো সম্পূরক নেই। হযরত রবী (রা.) হতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে-

যারা বলেন: দম দেওয়াই যথেষ্ট হবে, সাঈ কাযা করতে হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে-

হযরত যায়িদ বিন আবূ যুরকা হতে বর্ণিত, হযরত আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসূফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ ত্যাগকারী তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ফিরে আসলে ভালো, আর তা যদি না করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে। অন্য একদল বলেন, সাঈ অতিরিক্ত। তা ছেড়ে দিলে কোনো ক্ষতি নেই।[১৬]

মোটকথা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ ওয়াজিব। কারণ, তা আহকামে হজ্জের মধ্যে একটি। সুতরাং ওয়াজিব ছেড়ে দিলে তা কাযা সর্বোত্তম, আর দম দিলেই হয়ে যাবে। কেননা কাযা আদায়ের জন্য আবার ফিরে আসা অক্ষমকে বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর এবং শরীআত এ সব থেকে মুক্ত।[১৭]

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

যদি কেউ ওয়াজিব আদায় করার পরও অতিরিক্ত হজ্জ বা উমরাহ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ তাঁকে তার বিনিময় দেবেন। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তা করেছে। এজন্য আল্লাহ তাকে বিনিময় প্রদান করবেন। অন্য একদল এর অর্থ এভাবে বলেন, যে অতিরিক্ত নফল ইবাদত করতে চায়, সে উমরা করতে পারে। আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও খুব বেশি জ্ঞাত।

এজন্য বলা হয়েছে-

فالحج فريضة والعمرة تطوع ليست العمرة واجبة علي احد من الناس

অর্থাৎ হজ্জ হচ্ছে ফরয এবং উমরাহ হচ্ছে নফল বা অতিরিক্ত। উমরাহ কারো উপর ওয়াজিব নয়।[১৮]

১. তাবারী, ৩/২২৪-২২৫; ২. তাবারী, ৩/২২৬; ৩. তাবারী, ৩/২২৭-২২৮; ৪. তাবারী, ৩/২২৮; ৫. তাবারী, ৩/২২৯; ৬. প্রাগুক্ত; ৭. তাবারী, ৩/২৩০; ৮. তাবারী, ৩/২৩১; ৯. প্রাগুক্ত; ১০. প্রাগুক্ত; ১১. তাবারী, ৩/২৩৬-২৩৭; ১২. তাবারী, ৩/২৩৮; ১৩. তাবারী, ৩/২৩৯-২৪০; ১৪. তাবারী, ৩/২৪০-২৪১; ১৫. তাবারী, ৩/২৪১; ১৬. প্রাগুক্ত; ১৭. তাবারী, ৩/২৪৩; ১৮. তাবারী, ৩/২৪৭-২৪৮;

হাদীস

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মুবারক

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ

-হযরত জুবাইর ইবন মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী, যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে মিটিয়ে দেন, আমি হাশির, আমার পদপ্রান্তে (কিয়ামতের দিন) মানুষদের একত্রিত করা হবে আর আমি আকিব তথা সর্বশেষ। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৫৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৯৪)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, আকিব ঐ ব্যক্তি যার পরে কোনো নবী নেই। (সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত)

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ

-হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাঁর নিজের অনেকগুলো নাম বলতেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আহমদ, আল-মুকাফ্ফী (সর্বশেষ), আল-হাশির (সমবেতকারী), তাওবার নবী ও রহমতের নবী। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৯৭)

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণবাচক আরো অনেক নামের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম জাযূলী (র.) দালাইলুল খাইরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ২০১টি নাম উল্লেখ করেছেন।

বংশ মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যুগে যুগে মানবজাতির সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছি। সর্বশেষ আমি সেই যুগেই জন্মেছি যে যুগ আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৩০৫)

عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ رضى الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

-আবূ আম্মার শাদ্দাদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (র.) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ ইসমাঈল (আ.) এর সন্তানদের মধ্য থেকে 'কিনানা' কে বাছাই করেছেন। আর কিনানা থেকে কুরাইশকে বাছাই করেছেন, কুরাইশ থেকে বনূ হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৩৯)

শুভজন্ম

عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل– وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بي أمي على الموضع قال ورأيت خذق الفيل أخضر مميلا.

-হযরত মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ তার পিতার সূত্রে তার দাদা হযরত কাইস ইবনু মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমুল ফিল (অর্থাৎ আবরাহার হস্তি বাহিনী কাবাঘর আক্রমণের বছর) জন্মগ্রহণ করি। তিনি আরো বলেন, উসমান ইবন আফফান (রা.) বনূ ইয়া'মার বিন লাইস গোত্রের ভ্রাতৃপ্রতীম কুবাস বিন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন, আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাইতে অনেক বড়, তবে জন্মের দিক থেকে আমি অগ্রজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমুল ফীল তথা হস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেছেন। আর আমার মা আমাকে সে বছর এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে গিয়ে আমি হাতিগুলোর মলের রং পরিবর্তিত হয়ে সবুজে হয়ে যেতে দেখেছি। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৬১৯)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ.

-হযরত আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ঐদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬২১)

শারীরিক সৌন্দর্য ও চেহারা মুবারক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ .

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভ্রতায় এমন ছিলেন যেন তাঁকে রৌপ্য দ্বারা বানানো হয়েছে এবং তাঁর চুলগুলো ছিল কিছুটা কোঁকড়ানো। (শামাইলে তিরমিযী, হাদীস-০৯)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضى الله عنه يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

-তাবিঈ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত বারা (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন চেহারার দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর, গঠনের দিক থেকেও সবচেয়ে সুন্দর । তিনি অতি লম্বা ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৯৭)

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ رضى الله عنه أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ

-আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত বারা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী করীম ﷺ-এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো ছিল? তিনি বললেন না, বরং চাঁদের ন্যায় ছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৩০০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

-হযরত জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জোছনা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে তাকালাম। তখন তার পরনে ছিল একজোড়া লাল ডোরাদার পোশাক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি আমার কাছে চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর মনে হলো। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-২৮১১)

নবুওয়াতের সূচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য নুবুওয়াত কখন থেকে সাব্যস্ত হয়েছে? তিনি বললেন, যখন আদম আলাইহিস সালাম রূহ ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৬০৯)

যুহুরে নুবুওয়াত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم

-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর চল্লিশ বছর বয়সে ওহী অবতীর্ণ হয়। এরপর তিনি মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। তারপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হলে তিনি হিজরত করে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন। এরপর তাঁর ইন্তিকাল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৫৭২)

তিনি আদম সন্তানদের সরদার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের সরদার হবো । আমিই হবো সেই ব্যক্তি, যার কবর প্রথম উন্মুক্ত করা হবে। আর আমিই হবো প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৪১)

শাফাআতসহ পাঁচটি বিশেষ বিষয় তাকে দান করা হয়েছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

-হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি।

১. আমাকে এক মাসের দূরত্ব থেকে ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (অর্থাৎ কাফিররা এক মাসের দূরের পথ থেকে আমাকে ভয় পায়)।

২. সারা দুনিয়া আমার জন্য পবিত্র ও নামাযের জায়গা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মাতের যে কোনো লোক ওয়াক্ত হলেই যেন সালাত আদায় নেয়।

৩. আমার জন্য গানীমাতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি।

৪. আমাকে শাফাআতের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

৫. সকল নবী কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হতেন। আর আমাকে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৪৬)

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601



প্রবন্ধ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুন্দর আকৃতি ও আচার-আচরণ

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ট জীব মানুষের মধ্যে যিনি ছায়াহীন কায়ার একমাত্র অধিকারী, যাঁর পবিত্র মুখের লালা অতি মূল্যবান মহৌষধ এবং থুথু অতি উত্তম সুরভি। যাঁর পবিত্র অঙ্গের প্রতিটি ঘর্মবিন্দু বহুমূল্য মৃগনাভীর চেয়েও অধিক সুগন্ধময় এবং যাঁর পবিত্র প্রস্রাবের প্রতি কাতরা মিশকে আম্বরের থেকেও দামী। যাঁর মুবারক তনু পবিত্র নূর দ্বারা সৃষ্ট এবং যাঁর অপূর্ব সুন্দর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অলৌকিক শক্তি বলে বলীয়ান। তাঁর পাক পবিত্র সৌম্যাকৃতির যথাযথ বর্ণনা যে কত অসম্ভব তা সকল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে অবশ্য বিদিত।

যেমন বিখ্যাত মনীষী আল্লামা মুনাভী (র.) অতি দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই এরূপ আকীদা থাকা উচিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকমতয় দেহ যেসব গুণে গুণান্বিত সেসব গুণে গুণবান আর কেউ কখনও হয়নি বা কখনও হতে পারবে না। (খাসায়িলে নববী)

আল্লামা কুরতবী (র.) বলেন- নবীজির সমূহ সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশিত হয় নাই অন্যথায় লোক নবীজির দীপ্যমান সৌম্যমূর্তি দর্শনের ক্ষমতা রাখত না। (খাসায়িলে নববী)

সুতরাং যাঁরা নবীজির পবিত্র রূপলাবণ্যের সামান্যতম রম্যতা দর্শন করেছেন তাঁরা বিশ্বলোকের সমূহ সৃষ্টির মধ্যে নবীজিকেই সর্বাধিক সুন্দর বলে স্বীকার করেছেন। যেমন নবীজির প্রিয়তম পাত্রী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- যদি যুলাইখার সহচরীগণ নবীজির নূরানী চেহারার অপূর্ব সুন্দর জ্যোতি দর্শন করতেন তবে তারা নিজ নিজ হস্ত কর্তনের পরিবর্তে তাদের হৃদয় কেটে ফেলতেন। (খাসায়িলে নববী)

নবীজির একান্ত প্রিয় সহচর ও বিশ্বস্ত জামাতা হযরত আলী (রা.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত্যুজ্জ্বল নূরানী বদনের সীমাহীন সৌন্দর্য দর্শন করতঃ অতি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন- আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় এত সুন্দর সৌম্যাকৃতি তার পূর্বে ও পরে আর কাউকে দেখিনি। (শামায়িলে তিরমিযী, হাদীস-০৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম সাহাবী হযরত জাবির (রা.) বলেন- আমি কোনো এক চাঁদনী রাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অতি মনোমুগ্ধকর চন্দ্র মুখখানি দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমি সেই রাত্রে কখনও চন্দ্রের চপল জ্যোতি দর্শন করছিলাম আবার কখনও নবীজির সুশান্ত বদনের নূরানী আভা অবলোকন করছিলাম। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, নবীজির জ্যোতির্ময় মুখখানি উর্ধ্ব গগণের উজ্জ্বল চন্দ্র হতে অধিকতর সুন্দর। (শামায়িলে তিরমিযী, হাদীস-১০)

যাই হোক নবীজির এহেন মনোমোহনাকৃতির সামান্যতম বর্ণনা এবং তার অপূর্ব সুন্দর আচার আচরণের যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লোক সমক্ষে তুলে ধরার জন্য আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব গ্রহণযোগ্য কিতাবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি তন্মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামা লেখক ইমাম তিরমিযী (র.) লিখিত শামায়িলে তিরমিযী; বিশ্ববরেণ্য মনীষী কাযী আয়াদ (র.) এর লিখিত 'আশ শিফা বিতারীফি হুকুকীল মুস্তাফা', দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ শাহ আব্দুল হক মুহদ্দিসে দেহলভী (র.) রচিত 'মাদারিজুন নাবুওয়াত' এবং পবিত্র হারামে নববীর সুবিখ্যাত বক্তা আল্লামা জাফর ইবনুল হুসাইন (র.) রচিত মৌলুদে বরঝঞ্জী প্রভৃতি কিতাবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবীজির পবিত্র সুন্দর আকৃতি

উচ্চতার দিক দিয়ে যদিও নবীজি মধ্যমাকৃতির ছিলেন তবুও খোদা প্রদত্ত অলৌকিক শক্তিবলে সমবেত জনসমাবেশে তাঁর উন্নত মস্তক সর্বোচ্চ বলেই দর্শকের মন আকর্ষণ করত। তাঁর মাথার উপরের কেশধাম প্রায়ই কর্ণতল পর্যন্ত লম্বিত ন্যস্ত এবং স্বভাবত কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত ছিল। গায়ের রং ছিল ঈষৎ লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। সদা হাস্যে সমুজ্জল চেহারার উপর এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি সর্বদা বিরাজ করত। সীমাহীন সম্ভ্রম হেতু কেউ তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর চেহারার দিকে চক্ষু তুলে কথা বলার সাহস রাখত না। তাঁর অপূর্ব মান সম্ভ্রমের ছাপ দর্শনে আগন্তুকের মনে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হত।

নবীজির প্রশান্ত ললাট সামান্য প্রশস্ত এবং নাসিকা কিছুটা উন্নত ছিল। সুরমা মাখা নেত্রদ্বয় যথোচিত ভাটা ভাটা ও অতি সুদীপ্ত ছিল। ঘোর অন্ধকারেও তিনি দিবালোকের ন্যায় সমানভাবে দেখতেন। তিনি যখন কোনদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন তাঁর নয়নযুগলের অতি কৃষ্ণবর্ণ নয়নতারা দুটি অলৌকিক শক্তিবলে অত্যুজ্জ্বল তারকাসম জ্বলজ্বল করে উঠত। তিনি সামনে ও পিছনে সমভাবে দেখতেন। তাঁর যুগল বিযুক্ত অথচ অতি সুবিন্যস্ত ছিল। সুন্দর মুখমন্ডলের মধ্যে পবিত্র মুখখানি ছিল যথোচিত বিস্তৃত। দাঁতগুলো চিকন, চাকচিক্যময় এবং লালাসিক্ত। হাত পায়ের মাংসপেশীগুলো অতি সুষ্ঠু, সুন্দর ও মাংসযুক্ত। চরণদ্বয়ের নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত গভীর এবং উপরিভাগ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পৃষ্ঠ। চলাফেরার সময় তিনি অতি সুশিক্ষিত বীরের ন্যায় জোর কদমে চলতেন, তবে সেই চলন ছিল অতি আড়ম্বরশূন্য। হাঁটাচলার সময় তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পদক্ষেপ নিতেন যেন কোন উচ্চভূমি হতে নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করছেন। নবীজির পবিত্র বক্ষস্থল ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও পেট হতে সামান্য উন্নত। উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে অর্থাৎ বিস্তৃত পৃষ্টদেশের মাঝখানে কবুতরের ডিম্বাকৃতি একখন্ড মাংসের উপর অত্যুজ্জ্বল নূরানী অক্ষরে লেখা ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ইতিহাসের পাতায় তাই 'মুহরে নুবুওয়াত' নামে খ্যাত।

নবীজির মনোমোহন চেহারার উভয় পার্শ্বের দুটি কর্ণ এত সুন্দরাকৃতি বিশিষ্ট ছিল যেন প্রস্ফুটিত দুটি পুষ্প। তাঁর শ্রবণশক্তি ছিল এত প্রবল যে তিনি শূন্য পাকস্থলীর আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেতেন। এমনকি দূর আকাশের অতীত (বিশেষ ধরণের ঘর্ঘর শব্দ) পর্যন্ত তার পবিত্র কর্ণকুহরে ধরা পড়ত।

তাঁর মুখের লালা ছিল অতি সুমিষ্ট ও সুগন্ধময় মহৌষধ। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, খাইবার যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এর চক্ষু যন্ত্রণা দেখা দিলে নবীজি তাঁর চোখে আপন পবিত্র মুখের লালা সংযোগ করেছিলেন। পবিত্র লালার পরশে তৎক্ষণাৎ চক্ষু বেদনার উপশম ঘটেছিল।

হযরত আনাস (রা.) এর বিশেষ অনুরোধে নবীজি যখন তাঁদের কূপে আপন মুবারক মুখের পবিত্র লালা নিক্ষেপ করলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই কুয়ার পানি এত সুগন্ধময় ও সুস্বাদু হয়েছিল যে, কথিত রয়েছে তখনকার যুগে মদীনা শরীফে বর্ণিত কূপের পানিই সবচেয়ে সুস্বাদু ও

সুগন্ধময় বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, একদা নবীজির খিদমতে একপাত্র পানি আনা হলে তিনি এতে এক কুল্লি পানি নিক্ষেপ করতঃ সন্নিকটস্থ একটি কুয়ায় সেই পানিসমূহ ঢেলে দিতে নির্দেশ দান করলেন। নবীজির পবিত্র মুখের লালাসিক্ত বরকতময় পানির ছোঁয়ায় বর্ণিত কুয়ার পানি এত সুমিষ্ট ও সুগন্ধময় হয়ে উঠেছিল যে বহুদিন যাবৎ সেই কূপ হতে বহুমূল্য কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বের হয়েছিল।

অন্য আরেক দিনের কথা। নবীজির সমীপে কয়েকটি দুগ্ধ পোষ্য শিশুসন্তানকে হাযির করা হয়েছিল। নবীজি সস্নেহে তাদের মুখে আপন বরকতময় মুখের লালা প্রদান করলে তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা এমনভাবে বিদূরিত হয়েছিল যে তারা আর সেদিন আপনাপন মাতার দুগ্ধ পর্যন্ত পান করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছিল।

নবীজির জিহবা মুবারক ছিল অতি সুমিষ্ট ও সুশীতল লালাসিক্ত। বর্ণিত রয়েছে যে, একদা নবীজির প্রিয় পৌত্র হযরত হাসান (রা.) অতি তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় নবীজির সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তার মুখে আপন জিহবাগ্র প্রদান করেছিলেন । বালক হাসান (রা.) আস্তে ধীরে নবীজির পবিত্র জিহবা চোষণ করতঃ ক্ষণিকের মধ্যে এত পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন যে, উক্ত দিনে তিনি আর কোন পানাহার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

হযরতের নাসিকা মুবারক ছিল অতি সুন্দর নূরানী আভাযুক্ত অতি লাবণ্যময় মুখমন্ডলের ঠিক মধ্যভাগে যথোচিত উন্নত। অনিন্দ্যসুন্দর নাসিকা তাঁর চন্দ্রবদনের রম্যতা যেন আরও শতগুণ বৃদ্ধি করে রেখেছিল। বর্ণিত রয়েছে যে, হঠাৎ কোন আগন্তুকের দৃষ্টি নবীজির পবিত্র সুন্দর মুখমন্ডলের উপর নিপতিত হলে তাঁর সীমাহীন মান-সম্ভ্রমের চাপে সহসা আগন্তুকের আন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁর পবিত্র নাসিকা রন্ধ্রে পাপাত্মা ও পুন্যাত্মার আমল ধরা পড়ত। তাই বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে যে, নবীজির প্রিয়তম নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.) নবীজির খিদমতে হাযির হলে তিনি সস্নেহে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁর পাক ললাট চুম্বন করতঃ অতি আনন্দের সাথে বলতেন, ওহে মা ফাতিমা! আমি তোমার পবিত্র অঙ্গে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।

এক কথায় নবীজির আপাদমস্তক ছিল মহিমাময় খোদার বিচিত্র কলমে আঁকা নূরের ছবি। তাই নূরের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা যেমন দুষ্কর, ঠিক তেমনি নূর নবীজির পবিত্র নূরী বদনের যথাযথ ব্যাখ্যা করার দাবি করাও চরম ধৃষ্টতার নামান্তর মাত্র।

নূরনবী ﷺ এর অপূর্ব সুন্দর আচার আচরণ

স্বভাবতঃ নবীজি অত্যন্ত ভাবুক ও চরম লাজুক ছিলেন। ছোটবেলা হতে তিনি অতি নীরবে নির্জনে বসে পরম প্রভুর ধ্যান করতে ভালোবাসতেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর সেই ধ্যান-ধারণাও ক্রমশঃ বেড়ে চলল। তাই হযরত খাদিজা (রা.) এর পানি গ্রহণের পর তিনি হেরাপর্বতে নির্জন কন্দরে পরম প্রভুর আরাধনায় অতি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কঠোর তপস্যা ও চরম সাধনার পরে অবশেষে তিনি বর্ণিত গিরিগুহায় ধ্যানরত অবস্থায় প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করলেন। পবিত্র নবুওয়াত ও রিসালতের মহাদায়িত্ব নবীজির উপর অর্পিত হলো। কিন্তু খোদাপ্রেমে প্রেমাতুর নবীজির ধ্যানধারণার কোনো পরির্তন ঘটল না বরং তাঁর পবিত্র অন্তরের সুপ্ত প্রেমানল শত সহস্র শিখায় প্রোজ্জল হয়ে উঠল। বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি পরবর্তী জীবনে নানারূপ ইবাদত ও রিয়াযত তথা নামাযরূপী আরাধনার মাধ্যমে সারারাত্রি জাগ্রত থেকে পরম রবকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এককথায় সদা সর্বদা খোদাতাআলার প্রেমে বিভোর থেকে কায়মনোবাক্যে পরম রবের উপাসনা করতে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

নবীজি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও অতি সত্যপরায়ণ ছিলেন। ফলে পাপে-তাপে নিমজ্জিত অন্ধযুগের জনমানবের কাছেও তিনি 'আমীন' ও 'সাদিক' নামে পরিচিত ছিলেন। 'আমীন' শব্দের অর্থ বিশ্বস্ত ও 'সাদিক' শব্দের অর্থ সত্যবাদী।

নবীজি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, চরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় সহনশীলতা, অনুপম দয়া ও অনন্ত ক্ষমাগুণের নানা অপূর্ব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুএকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

পবিত্র ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে নবীজি তায়িফে উপস্থিত হলে তায়িফবাসীর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁর পবিত্র শরীর যখন রক্তাক্ত, এহেন দারুণ মুহূর্তে পাহাড় পর্বতের 'মুয়াক্কিল' (ভারপ্রাপ্ত) ফিরিশতা এসে নবীজির সমীপে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন- হে আল্লাহর পিয়ারা হাবীব! যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি উভয় পার্শ্বের দুটি উঁচু পর্বত উত্তোলন করতঃ বেদ্বীন অত্যাচারীদেরকে ক্ষণিকের মধ্যে পবর্ত বর্ষণে নিষ্পেষিত করে দেওয়ার জন্য খোদাতাআলার তরফ হতে আদিষ্ট হয়ে এসেছি। এখন এদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শুধু আপনার আদেশ দানের বিলম্ব মাত্র। দয়ার সাগর নবীজি, তিনি তো সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি, ক্ষমা ধর্মের প্রতিকৃতি, শান্তিকামী তিনি, প্রতিশোধ তাঁর কাম্য নহে। তাই করজোড়ে চরম মিনতির সাথে তিনি পরম রবের দরবারে আরয করলেন- ওহে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। আমার কাওমকে মার্জনা করে দাও এবং তাদেরকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শণ কর। কারণ তারা আমার প্রকৃত মান-মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। অন্য একটি বর্ণনায় আছে- যদিও তারা আমার উপর ঈমান আনেনি, হয়তো তাদের কোন বংশধর আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান আনতে পারে। সুবহানাল্লাহ! এমন নিদারুন মুহূর্তে এহেন সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও কি কেউ প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে এমন ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করতে পারে, প্রাণনাশে উদ্যত দুশমনদের জন্য কি কেউ এরূপ মঙ্গল কামনা করতে পারে? দয়াল নবী তাই করলেন।

আরেক দিনের কথা। নবীজি নজদ যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পথে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। নবীজি আপন সহচরগণ হতে অদূরে একটি নির্জন স্থানে নিজ গাত্রবস্তু উন্মোচন করতঃ রৌদ্রে শুকাতে দিয়ে একাকী অবস্থায় একটি বৃক্ষতলে আরাম করছিলেন। নবীজিকে শায়িত অথচ এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখে একজন শত্রু অতি সন্তর্পনে নবীজির শিয়রে এসে দাঁড়াল। শিকার নিজ হাতের মুঠোয় দেখে সে সানন্দে বিকট অট্টহাসি করতঃ খট করে তার তরবারি কোষমুক্ত করল। তরবারি খোলার শব্দে নবীজির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় উলঙ্গ তরবারি হাতে সে নবীজিকে জিজ্ঞেস করল- হে মুহাম্মদ! বলতো আজ তোমাকে কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? নবীজি অতি নির্ভীকভাবে উর্ধ্বগগণের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন- 'আল্লাহ'। আকাশ বাতাস তথা চতুষ্পার্শ্বের পাহাড় পর্বত ও তরুলতা হতে শত সহস্র কণ্ঠে সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হলো- 'আল্লাহ'। এক অজানা আতঙ্কের ছোঁয়ায় শত্রুর সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। ঝনাৎ করে তার হাতের তরবারি মাটিতে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ নবীজি সেই তরবারি নিজ হস্তে ধারণ করতঃ সহাস্যে তাকে জিজ্ঞেস করলেন- বৎস, বলতো এখন তোমাকে কে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? অসহায় শত্রু সভয়ে উপুড় হয়ে নবীজির পা জড়িয়ে ধরে অতি করুণ সুরে উত্তর দিল 'আপনি'। নবীজির দীল দরিয়ায় ক্ষমার জোয়ার উঠল, তিনি সস্নেহে তাকে পদতল হতে উঠিয়ে অভয়দান করতঃ বললেন- যিনি আমাকে তোমার হাত হতে রক্ষা করেছেন, সেই দয়াময় রবই তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। কারণ তিনি ব্যতিত আর কেউই কাউকেও হত্যা কিংবা রক্ষা করতে সক্ষম নহে (কিছুটা ভিন্নতাসহ হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)।

নবীজির ক্ষমা ও দয়ার এরূপ লক্ষ লক্ষ কাহিনী নানা গ্রহণযোগ্য কিতাবাদির মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সীমিত পরিসরে এ প্রবন্ধে বর্ণিত দুটি ঘটনাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। হুযুর ﷺ খোদাতাআলার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন । আপদে-বিপদে তথা সর্বসময়ে তিনি খোদাতাআলার উপর ভরসা রাখতেন। তাই আরববাসী যখন নবীজির চরম শত্রু, বিশেষতঃ মক্কাবাসী বিধর্মীর দল যখন নবীজিকে প্রাণে মারার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠল। স্থানে স্থানে বিধর্মী নেতা কুরাইশদের পক্ষ হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে থাকল- যে মুহাম্মাদের ছিন্ন মুণ্ড এনে হাযির করতে পারবে, তাকে

একশত লাল উট তথা আরো কত কি পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই অর্থলোভী পিশাচের দল চারদিকে ওত পেতে বসে থাকল। কিন্তু নবীজির নির্ভিক অন্তরে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। কারণ আল্লাহ তার সহায় আছেন। তাই নিঃসঙ্গ নবীজি একাকী ঘর হতে বের হয়ে পড়লেন পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ছায়ার মত তার সঙ্গ নিলেন প্রিয়তম বন্ধুবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। গভীর রাত্রিতে তারা আশ্রয় নিলেন 'সূর' নামক পর্বতের নির্জন কন্দরে। ইতিহাসের পাতায় সেই গুহা 'গারে সূর' নামে পরিচিত।

নবীজি বর্ণিত গিরি গুহায় আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু সহ আশ্রিত। আর তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে এক সহস্র অশ্বারোহী। জোর কদমে ধপ ধপ শব্দে এগিয়ে আসছে শত্রুর মহা তেজস্বীঘোড়া। আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান, মৃত্যু অনিবার্য দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তিনি অতি ভয় মিশ্রিত স্বরে নবীজিকে সম্বোধন করে বললেন- আর দেরী নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! অবিলম্বেই আমরা শত্রুর হাতে ধরা পড়ব। কিন্তু নির্ভীক নবীজির চন্দ্রবদনে চিন্তার লেশ মাত্র নেই। তাঁর পবিত্র তনু-মন খোদাতে বিভোর। তিনি তার সহচরকে উত্তর দিলেন ভয় করিওনা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন (সূরা তাওবা, আয়াত-৪০)। সুবহানাল্লাহ! কী অপরূপ ভরসা। কেমন অবর্ণনীয় 'তাওয়াক্কুল'। ধেয়ে আসা শত্রু থমকে দাঁড়াল। শিকার নাগালের ভিতরে দেখে আরোহী শত্রু সরোষে কষাঘাত করল ঘোড়ার পিঠে। শব্দ উঠল 'কচাৎ, কচাৎ'। আঘাতের চোটে জোর পদক্ষেপ করতে চাইল তেজস্বী ঘোড়া। কিন্তু এর চারটি কদম হঠাৎ দেবে গেল কঠিন প্রস্তরময় ভূমিতে। ঘোড়াটি অনড়। তার সর্বাঙ্গ অসাড় ও নিস্পন্দ। সভয়ে আরোহী নিচে অবতরণ করল। এক অজানা ভয়ে তার সারা অঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাঁটু পেতে করজোড়ে যেই নবীজির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা তথা তার প্রাণ ভিক্ষা চাইল, সহাস্য বদনে দয়াল নবীজি তাকে মার্জনা করলেন। সুতরাং আর কাউকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করবে না প্রতিশ্রুতি দিয়ে অতি ভয়-বিহবল অন্তরে নবীজির চরম শত্রু পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে তার বাড়ির দিকে ফিরে চলল। যথাসময়ে নবীজি তাঁর অনুচরসহ নির্বিঘ্নে আপন গন্তব্য পথে রওয়ানা হলেন। নবীজি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। বর্ণিত রয়েছে যে, একদা কোনো এক ব্যক্তি নবীজির সমীপে কোন একটি আবেদন নিয়ে আসল। কিন্তু সে নবীজির অতুলনীয় রূপলাবণ্য ও অনুপম মান-সম্মান দর্শন করতঃ ভয়ে জড়সড় হয়ে এক অজানা আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে লাগল। নবীজি তার এমন অবস্থা দেখে সস্নেহে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, বৎস তুমি আমাকে ভয় করছ কেন? সত্য কথা বলতে আমি একজন মাতার সন্তান যিনি দুই বেলা বিনা ব্যঞ্জনে মাত্র শুষ্ক রুটি আহার করতেন।

নবীজি অতি সহজ অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সারা আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে নবীজি দীন-দরিদ্রের ন্যায় আপন পবিত্র পরিবারসহ দিনের পর দিন উপবাসে থাকতেন। সামান্য সাধারণ বস্ত্র পরিধান করতেন নিজের ছিন্ন বস্ত্র নিজে সেলাই করতেন। আপন পবিত্র হস্তে নিজ বকরি দোহন করতেন। নিজের ব্যবহৃত জুতা নিজেই মেরামত করতেন। ছোটদেরকে আদর এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদা তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন- যে ব্যক্তি ছোটদেরকে আদর এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে সে আমাদের দলভুক্ত বা আমাদের অনুগামী নয়।

দীন দুঃখীদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অতিথিদের পরিচর্যা, অসুস্থদের শুশ্রুষা, বিধবাদের সেবা এবং অভাবগ্রস্থদের দুঃখ মোচন ইত্যাদি সৎকর্মের মধ্যে তিনি সদা সর্বদা লেগে থাকতেন। গরীব দুঃখীদেরকে তিনি অতি মুক্ত হস্তে দান করতেন। বর্ণিত রয়েছে যে, হুনাইন যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর নবীজি মাত্র একদিনের মধ্যে গণীমতের পাঁচ লাখ দিরহাম ও অজস্র সম্পদ গরীব দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, উক্ত দিন দিবাগত রাতে নবীজি আপন পরিবারসহ উপবাসেই ছিলেন। এককথায় নশ্বরজগতের ধন দৌলত এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তির প্রতি নবীজির মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি সবসময় পরকালের চিন্তায় চিন্তিত এবং আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকতেন।

তাই সর্বগুণে গুণান্বিত এই মহান গুণমণির পবিত্র সুন্দর চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন- হে আমার পিয়ারা হাবীব ﷺ! নিশ্চয়ই তুমি অতি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা আল কালাম, আয়াত-০৪)। এবং সারা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে পরম রবের বাণী বিঘোষিত হয়েছে- হে বিশ্ববাসী! নিশ্চয়ই নবীজির পবিত্র সুন্দর জীবনাদর্শের মধ্যে নিহিত রয়েছে তোমাদের জন্য আদর্শ জীবন যাত্রার চরম সুন্দর নিদর্শন। (সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

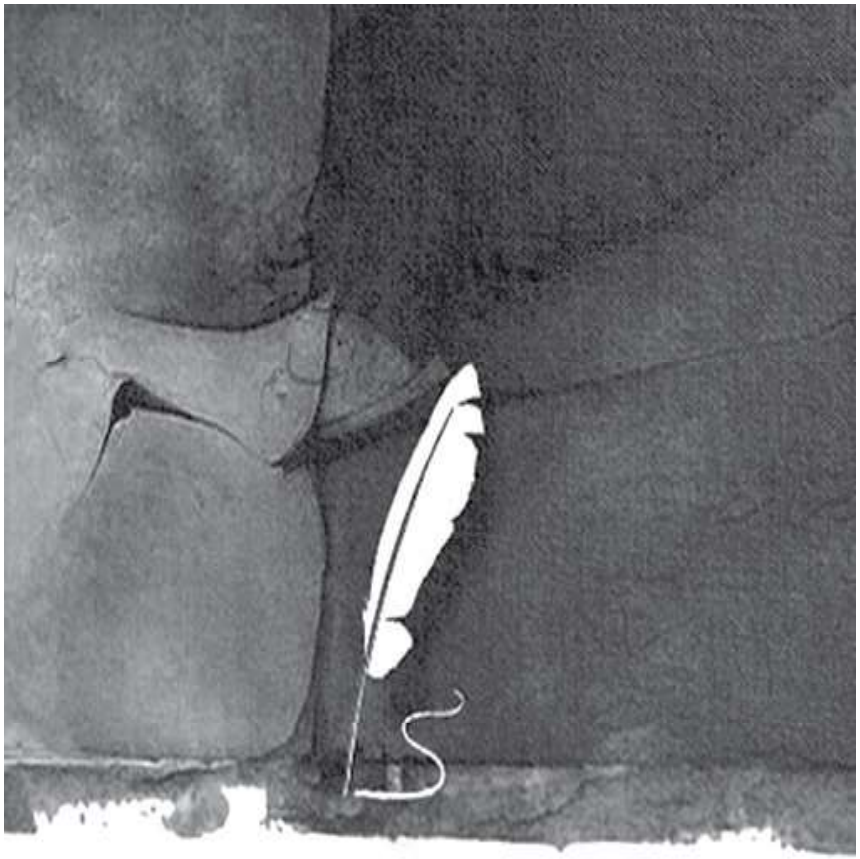
অতএব, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে আজ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে হলে নবীজির পবিত্র সুন্দর জীবনাদর্শের পর্যালোচনা করে তাঁর অপূর্ব সুন্দর আচার-আচরণের প্রতিচ্ছবি সারা বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। তবেই অশান্ত দুনিয়ার বিক্ষুব্ধ সাগরে ভাসমান মানবমণ্ডলীর জীবন শান্তি-সুখের মনমাতানো সৌরভে ভরে ওঠবে। অনাবিল প্রেমের ডোরে বাঁধা যাবে বিশ্ববাসীকে।

প্রোপ্রাইটর
বেলাল আহমদ
০১৭৫২ ২৮১৯৪০
০১৭৩১-২৫৯০৪৭



এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ন্যায্যমূল্যে পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

সিলেট মার্কেট, মহাজনপট্টি রোড, কালিঘাট, সিলেট



নবীগণ নিষ্পাপ

মুহাম্মাদ বদরুজ্জামান রিয়াদ

নবীগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে পরিচালিত এবং তাদের নিষ্পাপতা আল্লাহ পাক কর্তৃক স্বীকৃত। তাঁরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষকে কুফুরীর অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসা ছিলো তাঁদের একমাত্র মিশন। উম্মতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নবীগণের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 'আর নিশ্চয়ই তাঁরা (নবীগণ) আমার নিকট বাছাই করা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।' *(সূরা সোয়াদ: ৪৭)* তদুপরি কেউ কেউ কুরআন ও হাদীসের কিছু বাহ্যিক অর্থ বিবেচনা করে আম্বিয়ায়ে কিরামের মাসূমিয়াতকে অস্বীকার করেন। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত হলো সকল নবী মাসূম বা নিষ্পাপ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) (মৃ: ১৫০ হি.) বলেন,

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح

-নবীগণ সকলেই সগীরা, কবীরা, কুফর এবং মন্দ কাজসমূহ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র।

মুল্লা আলী কারী (র.) (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ – صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ – مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَصَغَائِرِهَا عَمْدِهَا وَسَهْوِهَا اهـ.

-মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, নিশ্চয়ই নবীগণ নবূওয়াতের পূর্বাপর সগীরা-কবীরা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকল প্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত। *(মিরকাত: ৫/১৭২০)*

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্রথমত ইসলামের মৌলিক দলীলসমূহের আলোকে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্পাপতার বিষয়টি আলোচনা করবো এবং শেষে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নবীর ওপর উত্থাপিত কিছু আপত্তির জবাব খোঁজার প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস তথা ইসলামের সকল মৌলিক দলীলের ভিত্তিতে একথা সুপ্রমাণিত। আদম (আ.) থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী নিষ্পাপ ছিলেন।

আল কুরআনের আলোকে

১. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

-তোমাদের যারা আল্লাহ ও পরকালকে পেতে চায় এবং বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব: ২১)*

তাই সকল নবী উম্মতের জন্য আদর্শ। তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ কারণে তাঁদের থেকে কখনোই কোনো প্রকারের গুনাহের কাজ প্রকাশ পেতে পারে না। আর এ আয়াতে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ সর্বোত্তম আদর্শ সম্পূর্ণ গুনাহর বিপরীত।

ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন,

ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط

-মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী, বান্দা এবং রাসূল। তিনি মনোনীত এবং পবিত্র। তিনি চোখের এক পলকের জন্যও মূর্তি পূজা এবং আল্লাহর সাথে শিরক করেননি। তিনি কখনোই সগীরা এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত হননি। *(আশ শরহুল মুয়াস্সার আলাল ফিকহিল আবসাত ওয়াল আকবার: ১/৩৯)*

২. নবী ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন,

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا

يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানিয়েছি। তিনি বললেন (হে আমার প্রতিপালক) আমার সন্তানদের থেকে। আল্লাহ পাক বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না। *(সূরা বাকারা: ১২৪)*

ইমাম হলেন যাকে অনুসরণ করা হয়। তাই যদি নবীদের গুনাহ প্রকাশ হয়, তবে উম্মতের জন্য সে গুনাহের কাজের অনুসরণ করাওতো আবশ্যক হয়ে পড়বে। যা অবাস্তব। তাই নবীগণ মাসূম হওয়া কুরআনের এ আয়াতেরও দাবী। তাছাড়া ইবরাহীম (আ.) এর সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াতের দায়িত্ব কোনো যালিম বা গুনাহগার পাবে না বলে আল্লাহ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন। তাই সকল নবীগণই নিষ্পাপ ছিলেন।

৩. আল্লাহ পাক শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

-নিশ্চয়ই যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। *(সূরা হিজর: ৪২)*

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে শয়তানের কর্তৃত্বকে অচল করে দিয়েছেন। আর নবীরা আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রিয় বান্দা। তাই তাঁরা শয়তানের কর্তৃত্বমুক্ত হওয়াই প্রমাণ করে যে, তারা নিষ্পাপ।

৪. আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তান তার ফন্দি পেশ করেছিলো,

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

-হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদেরকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করবো এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো। তবে আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। *(সূরা হিজর: ৩৯, ৪০)*

অত্র আয়াতে আল্লাহ মুখলিস বান্দাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারবে না বলে নিজেই বলেছেন। আর এ পৃথিবীতে নবীদের চেয়ে বেশি মুখলিস কারা হতে পারেন? তাই তাদের নিষ্পাপতার জোরালো প্রমাণ অত্র আয়াতে পাওয়া যায়।

৫. আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

-এরা (পূর্ববর্তী নবীগণ) এমন যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। *(সূরা আনআম: ৯০)*

অত্র আয়াত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তাদের অনুসরণ করতে নবী পাক (সা.) কে নির্দেশ দিচ্ছেন।

৬. কাওমের লোকেরা যখন হযরত নূহ (আ.) কে ভ্রান্ত বললো, তিনি তার জবাবে বললেন,

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনো ভ্রান্ত নই; বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল। *(সূরা আরাফ: ৬১)*

৭. নবীদের মূল্যায়নে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন,

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

-আর নিশ্চয়ই তারা (নবীগণ) আমার নিকট বাছাই করা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা সোয়াদ: ৪৭)*

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক নবীদেরকে তাঁর বাছাই করা উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই যদি তাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয় তবে আল্লাহ পাকের ঘোষণার কোনো মূল্য থাকে না।

আল হাদীসের আলোকে

১. উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) বলেন,

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله ، و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا

-নিশ্চয়ই নবী পাক (সা.) রাতে এতো বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর দু'পা মুবারক ফুলে যেতো। একদিন আয়িশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এতো কষ্ট কেন করছেন? আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন নবীজি জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহর শুকুরগুযার বান্দা হওয়াকে ভালোবাসবো না? *[বুখারী: ৪৪৬০]*

এ হাদীস প্রমাণ করে নবী পাক (সা.) নিষ্পাপ। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে পূর্বাপর গুনাহ থেকে মাফ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো গুনাহ সংঘটিত হওয়া থেকে পর্দা করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর মাগফিরাতের পর্দা সাধারণ বান্দাদের ক্ষেত্রে হয় তাদের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আযাব প্রাপ্তির মাঝে, আর নবীদের মাগফিরাতের পর্দা হয় গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আগেই। তাই তাদের মাগফিরাত অর্থ গুনাহ সংঘটিত হওয়া থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে পর্দা করে হিফাযত করেন। *(প্রান্ত টীকা, তাফসীরে জালালাইন)*

২. অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينٌ مِنَ الْجِنِّ ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَإِيَّايَ ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ.

-তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন জিন সঙ্গী থাকে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, এমনকি আপনার সাথেও হে রাসূল? নবী পাক (সা.) বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ পাক তার উপর আমাকে বিজয়ী করেছেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে কেবল ভালো পরামর্শই দেয়। *(মুসনাদে আবী ইয়ালা: ৫/৭৮)*

৩. অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا

-যখনই কোনো আদম সন্তান জন্ম নেয়, তখন তাকে শয়তান স্পর্শ করে এবং সে জোরে চিৎকার দেয়। তবে মারইয়ামের পুত্র এর ব্যতিক্রম। *(বুখারী: ৩১৭৭)*

এমন অসংখ্য হাদীস নবীদের নিষ্পাপতার প্রমাণ বহন করে।

যুক্তির নিরিখে

১. নবীগণ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যদি তারা গুনাহ করেন তবে তারা দ্রুত এবং ভয়ংকর আযাবের হকদার হতেন। আর নবীদের পূত-পবিত্র শানে তা বেমানান। নবুওয়াত ও রিসালাতের নিআমত সবচেয়ে বড়। *(ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) কৃত ইসমাতুল আম্বিয়া আ.)*

২. নবীগণ উম্মতের সাক্ষী। যদি তারা মাসূম না হতেন তবে তাদের সাক্ষী তো কবুল করা হতো না। অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

-অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারো। আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী। *(সূরা বাকারা: ১৪৩)*

আর গুনাহগারের সাক্ষী তো কবুল হওয়ার নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

-হে ঈমানদারেরা যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই

করে দেখো। *(সূরা হুজুরাত: ৬)*

৩. যদি নবীগণ মাসূম না হতেন এবং তাদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতো, তবে তাদেরকে অবশ্যই ধমক বা ধিক্কার দেওয়া হতো। অথচ এটা তাদের শানে মানানসই নয়।

৪. নবীগণ উম্মতকে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে থাকেন। কিন্তু যদি তারা নিজেরাই এর বিপরীত কাজ করেন, তবে তো আল্লাহ পাকের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

-হে ঈমানদারেরা তোমরা যা নিজে করো না, তা কেন বলো? তোমরা নিজেরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। *(সূরা আস সাফ: ২, ৩)*

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

-তোমরা কি মানুষকে নেক আমলের আদেশ করছো? অথচ নিজেরাই তা ভুলে আছো। *(সূরা বাকারা: ৪৪)*

আপত্তিসমূহ ও তার জবাব

কেউ কেউ নবীগণের নিষ্পাপতাকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন নবীগণ নিষ্পাপ নন; বরং তাদের থেকে কিছু গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছিলো। (নাউযুবিল্লাহ) তারা কুরআন ও হাদীসের কিছু বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। যদিও উম্মতের মূলধারার সকল আলিমই এ অবান্তর দাবিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করে এসেছেন। এবার আমরা সে সমস্ত আপত্তি ও তার জবাব খোঁজার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ।

১. নবী হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে

একদল হযরত আদম (আ.) এর ওপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, আদম (আ.) এর গুনাহের ব্যাপারে তো আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেন,

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

-আদম আল্লাহর 'নাফরমানী' করলেন এবং ভ্রমে পতিত হলেন। (সূরা তাহা: ১২১)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো আদম (আ.) গুনাহ করেছেন, তিনি নিষ্পাপ নন। তাছাড়া আল্লাহ পাক গন্দম থেকে নিষেধ করে বলেছিলেন যদি এ গাছের নিকটবর্তী হও তবে তোমরা হবে যালিম। আর এটাও তো নিষ্পাপতার বিপরীত।

জবাব

এটি পাপ ছিলো না; বরং ভুল ছিলো, যা আদম (আ.) এর নিষ্পাপ হওয়াকে নিষেধ করে না। এখানে عَصَى শব্দ দ্বারা পাপ নয়; বরং প্রকৃত অর্থে ভুল শব্দ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর غَوَى শব্দ দ্বারা ভ্রান্ত হয়েছেন নয়; বরং ধোঁকায় পড়েছেন এটা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

-আদম ভুলে গেছেন। আর আমি (ঐ ব্যাপারে) তার কোনো প্রকার দৃঢ় সংকল্প পাইনি। *(সূরা ত্বহা: ১১৫)*

তাছাড়া আদম (আ.) এর এ ঘটনার ব্যাপারে শয়তান অপরাধী। এর পুরো দায় আল্লাহ পাক শয়তানকে দিয়েছেন। আদম (আ.) এবং মা হাওয়া (আ.) এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা ধোঁকায় পড়েছেন। ধোঁকায় পড়ার অর্থ হলো, আল্লাহ পাক বলেছিলেন, আদম এ বৃক্ষের নিকটে যেও না। শয়তান ধোঁকা দিয়ে বললো, হে আদম! আল্লাহ পাক আপনাকে এর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এর ফল খেতে তো নিষেধ করেননি। তাই আমি তা এনে দেই আপনি খেয়ে নিন। এতে আদম (আ.) কে পাপী বলা ঠিক হবে না।

২. নবী হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে

মহাপ্লাবনের সময় হযরত নূহ (আ.) এর সাথে তাঁর তিন সন্তান সাম, হাম ও ইয়াফাস কিশতিতে ওঠলেন কিন্তু অপর সন্তান কেনান (ঈমানদার না হওয়ায়) পানিতে ডুবতে লাগলে নূহ (আ.) পুত্রস্নেহে আল্লাহর কাছে কেনানকে 'আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করে আল্লাহর করুণা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। আল্লাহ পাক জবাব দিলেন,

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

-হে নূহ! নিশ্চয়ই সে (কেনান ঈমান না আনার কারণে) তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই এটা সৎ কর্ম নয়। তাই আমার কাছে এমন দরখাস্ত করো না, যার খবর তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ো না। নূহ (আ.) বললেন, হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হবো। *(সূরা হুদ: ৪৬, ৪৭)*

আপত্তিকারীরা বলেন, এ আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ যে, নূহ (আ.) গুনাহ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ পাক কেনানকে পুত্র সম্বোধন করায় তাকে ধমক দিয়েছেন।

জবাব

সাহাবী হযরত ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবন যুবাইর (রা.), তাবিঈ হযরত দাহ্হাক, ইকরামা (র.) সহ অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, কেনান হযরত নূহ (আ.) এর নিজের পুত্র ছিলো, কিন্তু দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানদার না হওয়াতে সে পুত্রত্ব আর বাকী থাকেনি। আল্লাহ পাক তাই নূহ (আ.) কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর পাপী হওয়া আবশ্যক হয় না। অনুরূপ আল্লাহ পাক নূহ (আ.) কে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি মোটেও জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাননি। যেমন আমাদের নবী পাক (সা.) সম্পর্কেও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

-যদি আপনি শিরক করতেন, তবে আপনার নেক আমল ধ্বংস হয়ে যেতো এবং আপনি হতেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা যুমার: ৬৫)*

৩. নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ওপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। যেমন,

ক. মেলায় যেতে না চেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই আমি অসুস্থ' অথচ তিনি সুস্থ ছিলেন।

খ. নিজে মূর্তি ভাঙ্গার পর তা অস্বীকার করে বলেছিলেন, বরং সেই কাজটি করেছে মূর্তিটি।

গ. মক্কায় আসার পরে যালিম বাদশার নিকট স্ত্রী সারাকে তিনি বোন বলে পরিচয় দিয়েছেন।

এসমস্ত ব্যাপারে ইবরাহীম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, বিধায় তাকে নিষ্পাপ বলা যাবে না।

জবাব

অভিযুক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই ইবরাহীম (আ.) কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি মোটেও মিথ্যাবাদী ছিলেন না। যেমন মুল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

وَأَمَّا الْكَذَبَاتُ الْمَذْكُورَاتُ، فَإِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَهْمِ السَّامِعِ لِكَوْنِهَا فِي صُورَةِ الْكَذِبِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَيْسَتْ كَذَبَاتٌ.

- উল্লিখিত মিথ্যাগুলো শ্রোতার বুঝ অনুযায়ী বাহ্যিক দৃষ্টিতে মিথ্যা মনে হতে পারে, কিন্তু

প্রকৃত অর্থে এগুলো মিথ্যা নয়। *(মিরকাত: ৯/১৫৯০)*

উলামায়ে কিরাম ইবরাহীম (আ.) এর ওপর আরোপিত এ তিনটি অভিযোগের জবাবে বলেন,

ক. ইবরাহীম (আ.) শারীরিক অসুস্থ না হলেও কাওমের লোকদের এমন অবাধ মূর্তিপূজায় রপ্ত দেখে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, তাই বলেছেন আমি অসুস্থ। এটা মিথ্যা নয়।

খ. মূর্তিগুলো বড়টি ভেঙ্গেছে বলে ইবরাহীম (আ.) মুশরিকদের লা জাওয়াব করে দিতে চেয়েছেন। তাই এটা মিথ্যা নয়; বরং কৌশল। যদি এসমস্ত মূর্তি কথা বলতে ও শুনতে পারে মানুষের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে পারে, তবে তার কাছে তোমরা জবাব শুনে নাও।

গ. অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে নিজ স্ত্রী সারার ইয্যত রক্ষার জন্য তিনি তাকে নিজের বোন পরিচয় দিয়েছিলেন। আর দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অসত্যও নয়। কেননা, সে যমীনে তারা ছাড়া আর কোনো ঈমানদার ছিলেন না।

উপরোল্লিখিত তিনটি জায়গাতেই ইবরাহীম (আ.) তাওরিয়া করেছিলেন তথা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিলেন। যেমন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধাকে বলেছিলেন, কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। এর মানে হলো সকল বৃদ্ধাই যুবতী হয়ে জান্নাতে যাবে। আরেক সাহাবী কাজের জন্য একটা উট চাইলে রাসূল (সা.) তাকে বললেন তোমাকে উটের বাচ্চা দিবো। এর অর্থ হলো সকল উটই তো কোনো না কোনো উটের বাচ্চা।

৪. নবী হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে

হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ওপর যে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় তা হলো,

ক. ইয়াকূব (আ.) তাঁর অন্য সন্তানদের চেয়ে ইউসুফ (আ.) কে বেশি যত্ন করতেন, যা হিংসা ও ঝগড়ার কারণ এবং এটা অনুচিত।

খ. ইয়াকূব (আ.) পুত্রের বিরহে অতিরিক্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং অধিক কান্নাকাটি করেছিলেন, যা আল্লাহর ওপর ভরসার বিপরীত এবং অন্যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

এসমস্ত কারণে তাকে নিষ্পাপ বলা যাবে না।

জবাব

ক. প্রথমত: ইয়াকূব (আ.) সন্তান লালন-পালন বা দেখা-শুনার ক্ষেত্রে কোনোই তারতম্য করেননি। কিন্তু ইউসুফ (আ.) এর প্রতি তাঁর মহব্বত কিছুটা বেশিই ছিলো, যা মানবীয় প্রকৃতিগত ব্যাপার। এ কারণে তাকে দোষী বলা যাবে না। তাছাড়া তাঁর এ মহব্বত যে হাসাদ বা হিংসা তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কেননা, তাঁর অন্য সন্তানরা বাহ্যিকভাবে ইউসুফ (আ.) এর প্রতি খুব মহব্বত দেখাতো।

খ. দ্বিতীয়ত: তিনি বেশি কেঁদেছেন এটাও নিষ্পাপতার বিপরীত নয়। সন্তান হারানোর বেদনায় না কেঁদে ধৈর্য ধরা উত্তম, কিন্তু তার বিপরীতে কাঁদা নিষেধ নয়।

৫. নবী হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে

সূরা ইউসুফে রয়েছে,

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

-নিশ্চয়ই (যুলাইখা) তাঁর ব্যাপারে চিন্তা করেছিলো এবং তিনিও তার ব্যাপারে চিন্তা করতেন, যদি না তিনি স্বীয় প্রতিপালকের মহিমা অবলোকন করতেন। *(সূরা ইউসুফ: ২৪)*

জবাব

এ আপত্তির জবাব আল্লাহ পাক নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

-এটা এ কারণে যে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (সূরা ইউসুফ: ২৪)

এ আয়াতে মন্দ কাজ দ্বারা সগীরা গুনাহ এবং নির্লজ্জতা দ্বারা কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ (আ.) থেকে দূর করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ইউসুফ (আ.) কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে দূর করা হয়েছে বলা হয়নি। এতে একথার ইশারা রয়েছে যে, ইউসুফ (আ.) নিজেই এ গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ তাকে পরিবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিলো। অতএব কুরআনে পাকের এ আয়াত দ্বারা তাঁকে গুনাহগার প্রমাণ করার ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া এর পরেই আল্লাহ পাক তাকে মনোনীত বান্দা বলে পরিচয় দিচ্ছেন।

৬. নবী হযরত আইয়ূব (আ.) সম্পর্কে

হযরত আইয়ূব (আ.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আল্লাহ পাককে বলেছেন,

أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

-হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান কষ্ট ও আযাব দ্বারা স্পর্শ করেছে। *(সূরা সোয়াদ: ৪১)*

এ আয়াত প্রমাণ করে তিনি আযাব পেয়েছেন। আর আযাব তো পাপের কারণেই হয়ে থাকে।

জবাব

আযাব পাপ ছাড়া হয় না একথা পুরোপুরি সঠিক নয়। পাপ ছাড়াও পরীক্ষার জন্য কষ্ট দেয়া হতে পারে। আর শয়তানের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, শয়তান ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে হযরত আইয়ূব (আ.) এর প্রশংসা করে বলেছেন-

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

-নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল, উত্তম বান্দা পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই তিনি অনুগত। *(সূরা সোয়াদ: ৪৪)*

যদি তিনি আযাবপ্রাপ্ত হতেন আর আল্লাহ এসত্ত্বেও তাঁর প্রশংসা করতেন, তাহলে তো তাঁর পাপের প্রশংসা করা হতো। আর এটাতো জায়িয হতে পারে না।

৭. নবী হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, মূসা (আ.) এক কিবতীকে থাপ্পর মেরেছিলেন, যার ফলে সে মারা যায়। তাই মূসা (আ.) হত্যাকারী, আর হত্যাকারীতো নিষ্পাপ হতে পারেন না।

জবাব

মূসা (আ.) কিবতীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে থাপ্পর মারেননি; বরং শাসন করার উদ্দেশ্যে মেরেছিলেন। আর এতেই সে মারা যায়। হত্যার উদ্দেশ্যে যেহেতু মারেননি তাই এটা তার পাপকর্ম ছিলো না। আর কুরআন শরীফে তো বলাই হয়েছে, هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ এটা শয়তানের কাজ। *(সূরা কাসাস: ১৫)*

৮. নবী হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে

দাউদ (আ.) উরিয়ার স্ত্রীর প্রতি দুর্বল হয়েছিলেন। যার আলোচনা সূরা সোয়াদে করা হয়েছে। এটা নিষ্পাপ হওয়াকে নিষেধ করে।

জবাব

দাউদ (আ.) এর এ ঘটনাতে অনেক রদবদল হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য হযরত আলী (রা.) এ ফরমান জারি করেছিলেন, যে ব্যক্তি দাউদ (আ.) এর কাহিনী গুজব আকারে বর্ণনা করবে তাকে অপবাদ আরোপের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬০ দুররা মারা হবে।

মূল ঘটনাটি ছিলো উরিয়া নামক এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলো আর সেই প্রস্তাবের ওপর দাউদ (আ.)ও প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ঐ মহিলা দাউদ (আ.) এর প্রস্তাব কবূল করে তাঁর সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো। উরিয়ার

সাথে মোটেই এই মহিলার বিয়ে হয়নি। তাই তিনি পরস্ত্রী ছিলেন না। তাই তাঁর বিয়েটা বৈধ ছিলো।

কিন্তু এ বৈধ কাজও নবুওয়াতের শানে বেমানান বিধায় আল্লাহ তাআলা দু'জন ফিরিশতাকে মুকাদ্দামা দিয়ে পাঠালেন, যাদের একজনের ৯৯ টি বকরি আছে আরেক জনের আছে মাত্র ১ টি। আর প্রথম জন ঐ ১টিও নিয়ে নিতে চায়। এর দ্বারা আল্লাহ পাক নবীকে প্রচ্ছন্ন শিক্ষা দিলেন কারণ দাউদ (আ.) এর অধীনে তখন ৯৯জন স্ত্রী ছিলেন। সুবহানাল্লাহ।

৯. নবী হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে

সূরা সোয়াদে রয়েছে,

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ . فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

-যখন তাঁর (সুলাইমানের) সামনে শেষ প্রহরে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন আমি তো আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি– এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর তিনি এদের পা ও গলদেশ কাটতে লাগলেন। *(সূরা সোয়াদ: ৩১,৩২)*

সুলাইমান (আ.) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, আসরের নামাযের সময় চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি অশ্বগুলিকে যবেহ করে দেন। আর অশ্বগুলিকে যবেহ করে দেওয়া তো অপরাধ।

জবাব

এ আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, সুলাইমান (আ.) এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি করা অশ্বরাজি পেশ করা হয়েছিলো। তিনি মুগ্ধ হলেন আর মুগ্ধতাও আল্লাহর পথে জিহাদে প্রস্তুত ঘোড়া দেখে হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে তা দৃষ্টি থেকে উধাও হলে তিনি এগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে বললেন। ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর তিনি এগুলোর গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। অত্র আয়াতে মাসেহ এর অর্থ কর্তন নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো অর্থ করা হয়েছে। *(তাফসীরে তাবারী: ২১/১৯৩)*

তাছাড়া যদি এর বাহ্যিক অর্থ কর্তন করে নেয়া হয়, তাতেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। কেননা, এ অশ্বরাজি সুলাইমান (আ.) এর ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলো এবং তিনি সেগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় উট, গরু বা ছাগলের ন্যায় কুরবানী করেছিলেন। আর তাঁর শরীআতে ঘোড়া যবেহ করাও বৈধ ছিলো।

১০. নবী হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে

ইউনুস (আ.) সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ.

-এবং মাছওয়ালার (ইউনুস (আ.) এর) কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধরতে পারবো না। *(সূরা আম্বিয়া: ৮৭)*

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী ইউনুস (আ.) আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট না থেকে তাঁর ওপর রাগ করে বের হয়ে গেছেন। এটা তো অন্যায়। আর আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ

-আপনি আপনার প্রভুর হুকুমে সন্তুষ্ট থাকুন। মাছওয়ালার মতো হবেন না। *(সূরা কলম: ৪৮)*

জবাব

ইউনুস (আ.) মোটেই আল্লাহ পাকের বিধানের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বের হননি; বরং তিনি নিজ কাওমের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলেন। আর নবী পাক (সা.) কে মাছওয়ালা নবীর মতো হতে নিষেধ করার অর্থ হলো উত্তম আমলকে ইখতিয়ার করা। কেননা, ইউনুস (আ.) এর আমলটি নাজায়িয ছিলো না; বরং তা ছিলো উত্তমের বিপরীত। তাই নবীজীকে উত্তমতা তথা ধৈর্য ধারণের আদেশ দিয়েছেন। আবার لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এর অর্থ হলো আমি সংকোচন করবো না। যেমন কুরআনে পাকের অন্যত্র আছে,

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

-আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং সংকোচন করেন। *(সূরা রাদ: ২৬)*

১১. সাইয়্যিদুল আম্বিয়া নাবিয়্যিনা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে

ইসমাতে আম্বিয়া অস্বীকারকারীদের কলমের খোঁচা থেকে কোনো নবী-ই বাদ পড়েননি, এমনকি তারা আখেরী নবী, নবীদের সরদার মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কেও আপত্তি উত্থাপন করেছে। যেমন-

ক. আল্লাহ পাক নবীজীর ব্যাপারে বলেন-

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى

-হে নবী আপনার প্রভু আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর সুপথ দেখিয়েছেন। (সূরা দোহা: ৭)

খ. আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

-যাতে করে আল্লাহ পাক আপনার আগে পরের গুনাহ মাফ করেন। (সূরা ফাতহ: ২)

জবাব

ক. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন,

সূরা দোহাতে 'পথহারা' বলতে আল্লাহ পাক গোমরাহ বুঝাননি; বরং বুঝিয়েছেন, আপনাকে আপনার প্রভু পেয়েছেন জীবন ধারণের পদ্ধতির ব্যাপারে অজ্ঞ।

অথবা আপনাকে অচেনা তথা কাওমের লোকেরা আপনাকে চিনতে পারছে না এমন অবস্থায় পেয়েছেন।

খ. গুনাহ মাফ করতে পারেন এর অর্থ হলো নিষ্পাপ ও হিফাযতে রাখা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেন সবসময় আপনাকে গুনাহমুক্ত পবিত্র রাখেন। যেমন তাফসীরে রূহুল বায়ানে রয়েছে,

المراد بالمغفرة الحفظ والعصمة ازلا وبدا فيكون المعنى ليحفظك الله ويعصمك من الذنب المتقدم والمتأخر

-মাগফিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিফাযত করা ও নিষ্পাপ রাখা, যেহেতু এটা (নবুওয়াতের শানে) আবশ্যক। *[রূহুল বায়ান: ১৩/৪৭২]*

সংক্ষেপে, আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে এমন আপত্তিকর কথা যদি মনে উদ্রেক হয়, তবে অবশ্যই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানা আবশ্যক, কেবল বাহ্যিক অর্থের ওপর নির্ভর করে তাদের সুমহান ব্যক্তিত্বে কালিমা লেপন করা জঘন্য গুনাহের কাজ। এমনকি উলামায়ে কিরাম কুফুরী পর্যন্ত বলেছেন। আল্লামা মুল্লা জিয়ূন (র.) বলেন,

'আর আম্বিয়া (আ.) সম্পর্কে মিথ্যা বা অবাধ্যতা ইত্যাদি যা কিছু বুঝা যায় এমন যা কিছু বর্ণিত আছে, তা যদি হাদীসে খবরে আহাদ হয় তবে তা পরিত্যাজ্য। আর যা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত, সেগুলো পারলে বাহ্যিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করতে হবে, অথবা তা উত্তমতার বিপরীত মনে করতে হবে।'

তাই আমাদের সকলকেই নবীগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাশহুর আকীদা পোষণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম আমাদের ঈমান আমলকে ঝুঁকিতে ফেলবে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবূল করুন। আমীন।

ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে আযমতে রাসূল ﷺ

প্রতিতুলনায় সমসাময়িক স্খলনচিত্র ও এর উৎস সন্ধান

মুহাম্মাদ সায়ীদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আদম সন্তানদের সরদার। সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অবস্থান সর্বোর্ধ্বে এবং তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামে স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণিত। কুরআন ও হাদীস সূত্রে প্রমাণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদার ব্যাপারে মুসলমানের নিঃশর্ত স্বীকৃতির সহস্র বছরেরও দীর্ঘকালের পরম্পরায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আযমত ও আফদালিয়্যাত দুনিয়ার সকল মুমিনের নিকট অলঙ্ঘ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই নন বরং ইসলামী আকাইদ অনুসারে সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনা আবশ্যক, এবং তারা সবাই সম্মানীয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট সকল নবী নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টিও বহুল স্বীকৃত আকীদাহ। তাছাড়া নবী-রাসূলগণের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া কারো জন্য অনুমোদিত নয়, এমনকি নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে বর্ণিত বাহ্যিক বিচ্যুতিগুলো নিয়েও সমালোচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. (৫৪৪ হি.-৬০৬ হি.) বলেছেন-

সাহাবীদের কারো ব্যাপারে আমরা এমন শুনিনি যে, হযরত আদম (আ.) কীভাবে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গাছটির ফল খেয়েছেন, এ বিষয়ে তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আলোচনা করেছেন। অথচ معصية বা অবাধ্যতার আলোচনা করতে হলে এই ঘটনাটি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্ট। আদম (আ.) ছাড়া অন্যান্য নবীদের ব্যাপারেও এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাসূল ﷺ এর সাথে সাহাবীরা এরকম আলোচনা করেননি, যেরকম পরবর্তীরা করে থাকেন। (ইসমাতুল আম্বিয়া)[১]

ইসলামে সকল নবী-রাসূল সম্মানিত, তবুও স্তর বিবেচনায় রাসূল ﷺ এর মর্যাদা সুউচ্চ ও অতুলনীয়। মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে বিশিষ্টতা দিয়েছেন, এমনকি রাসূল ﷺ এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মুমিনদেরকে বিশেষ রীতি ও ধারায় অভিগমন (Approach) করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

-রাসূল ﷺ এর আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। (সূরা আন নূর, আয়াত- ৬৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুতাকাদ্দিমীন মুফাসসিরগণের বড় অংশের মত হচ্ছে- রাসূল ﷺ কে সাধারণের মত يا محمد বলে ডাকা যাবে না। বরং يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي বলে সম্বোধন করতে হবে। (موسوعة التفسير المأثور)

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

-তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-২)

তাফসীরে তাবারীতে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) (৩১০ হি.-৪২২ হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজের মাফহুম উল্লেখ করেছেন-

আর যেভাবে তোমরা একে অপরকে নাম ধরে ডাকো, তাঁকে সেভাবে 'হে মুহাম্মদ', 'ওহে মুহাম্মদ', বলে ডেকো না। বরং তাঁকে তাঁর সম্মান, গাম্ভীর্য, মর্যাদা দানপূর্বক মৃদু ভাষায় এবং উত্তম সম্বোধনে 'হে আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রাসূল' বলে ডাকো। (তাফসীরে তাবারী)[২]

রাসূল ﷺ এর সাথে যেকোনো দিক থেকে বেমানান হতে পারে, এমন কোন কিছু তাঁর শানে প্রয়োগ করাকে নাকচ করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا.

-হে মুমিনগণ! তোমরা 'রায়িনা' বলো না, 'উনযুরনা' বল এবং যা বলা হয় তা শোনো। (সূরা বাকারা, আয়াত-১০৪)

আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে রায়িনা বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন, কারণ রায়িনা শব্দটি নেতিবাচক বা অপমানজনক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আয়াতের নির্দেশনা হতে প্রতীয়মান হয়- রাসূল ﷺ এর শানে শব্দপ্রয়োগের বেলায় নেতিবাচকতার সম্ভাবনা আছে এমন কোন শব্দ প্রয়োগ হতে বিরত থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যে নির্দেশনা কুরআনে পাওয়া যায়, এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী বিদ্যায়তনিক পরিসরে (Islamic Academia) রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ইয্যত-হুরমতের ব্যাপারে সতর্কতা ও সংবেদনশীলতার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐতিহ্য সহস্র বছরেরও দীর্ঘ সময়ে ধরে অলঙ্ঘিত, এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত। এরই ধারাবাহিকতায় উম্মাহর ইমামগণ কুরআনের তাফসীর, হাদীসের

আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন- তিঁনি ‘বড়’, তবে আমি তাঁর জন্মের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। (আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন)

ব্যাখ্যা, কালাম-আকাইদের তত্ত্বকথা, সীরাত ও ফিকহ সংক্রান্ত রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর শানে শব্দপ্রয়োগের বেলায় তাঁর আযমাত ও আফদালিয়্যাতের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক উৎস থেকে নেয়া যেকোন টেক্সটের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যখনই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়েছে, সাহাবা-তাবিঈন, সালফে সালিহীন ও ইমামগণ সেখানে রাসূল ﷺ এর মর্যাদার আসনকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নশীলতা অবলম্বন করেছেন। রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহাবীদের সতর্কতা ও শিষ্টাচারের নমুনা ছিলো অবিস্মরণীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় তাদের যে নিখুঁত মনোনিবেশ, এ ব্যাপারে ধারণা নেয়ার জন্য নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতগুলো দেখা যেতে পারে-

আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে-

سئل العباس: «أيكما أكبر، أنت أم رسول الله، قال: هو أكبر مني، وأنا ولدت قبله (المستدرك على الصحيحين)

-আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি বড় নাকি রাসূল ﷺ বড়? আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন- তিঁনি ‘বড়’, তবে আমি তাঁর জন্মের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। (আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন)

কুবাস ইবন আশইয়ামকে ও উসমান ইবন আফফান (রা.) এর কথোপকথনে রাসূল ﷺ এর প্রতি বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে-

وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمُرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلاَدِ. (سنن الترمذي)

-ইয়াসার ইবন লাইস গোত্রীয় কুবাস ইবন আশইয়ামকে উসমান ইবন আফফান (রা.) প্রশ্ন করেন, আপনি ‘বড়’ নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চাইতে ‘অনেক বড়’ তবে আমি তার আগে জন্মগ্রহণ করি। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৬১৯)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত কুবাস ইবন আশইয়াম (রা.) বয়সে কে বড়- এই প্রশ্নের উত্তরে নিজেরা বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ এর বিপরীতে নিজেদেরকে বড় না বলে, ব্যতিক্রমী ধরণের বাক্যশৈলী প্রয়োগ করে উত্তর দিয়েছেন। এভাবেই তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মতরভাবে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে আদবের অনুশীলন করছেন। রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে আমাদের পূর্বসূরীদের এধরণের অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাবোধ থেকে পাঠ গ্রহণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর একাডেমিয়া সামন পানে এগিয়েছে এবং নবী করীম ﷺ এর মান-মর্যাদা সংরক্ষণে আদবসম্মত জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য উন্নয়ন করেছে। রাসূল ﷺ এর ইয্যত-সম্মানের প্রশ্নে সাহাবা-তাবিঈনসহ আমাদের পূর্বসূরিগণের এই যে সর্বাত্মক সূক্ষ্মদৃষ্টির অবতারণা, এগুলো কোন বিরল দৃষ্টান্ত নয়। রাসূলে পাক ﷺ এর শান ও আদব রক্ষার ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলো সালাফে সালিহীনের অবস্থানের প্রতিনিধিস্থানীয় চিত্র, এবং রাসূল ﷺ এর সাথে সম্পৃক্ত যে কোন আলোচনা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিবেচনায় এটাই ইসলামের মূলধারার ইলমী তুরাস বা ঐতিহ্য আহরিত নির্দেশনা। এর বিপরীত চিত্র তথা রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে লাগামহীনভাবে অসংলগ্ন কথা বলা ও সতর্কতা পরিহার করে প্রগলভ শব্দপ্রয়োগ- বিচ্ছিন্নতা ও অর্বাচীনতা। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের দেশের সমসাময়িক ওয়াইয বা তথাকথিত দাঈদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কাছ থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে এমন বিচ্ছিন্নতা ও অর্বাচীনতারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি। কোন ধরণের ইলমী ভিত্তির দ্বারা সমর্থিত নয়- এমন কথাও রাসূল ﷺ এর শানের বিরুদ্ধে তারা বাগাড়ম্বরভাবে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। রাসূল ﷺ কে স্বপ্নে দেখলে জান্নাতী হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে এসংক্রান্ত হাদীসগুলো থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ একজন বলেছেন- সরাসরি দেখেও তো জান্নাতী হওয়া যায়নি, স্বপ্নে দেখলে কীভাবে হবে? শিরকের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় সন্দেহপরায়ণতার কারণে কেউ বলেছেন- রাসূল ﷺ কে নিয়ে ওয়াসীলা করা যাবে না, আবার রাসূল ﷺ কে অনুসরণের গুরুত্ব দিতে গিয়ে এদের একজনকে বলতে শোনা গেছে- রাসূল ﷺ কে ভালোবাসার কথা কুরআন হাদীসের কোথাও বলা হয়নি! কেউ আবার রাসূল ﷺ এর শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে বলেছেন- নবীজির পেটটা ছিলো চাপা, সিক্স প্যাক, রাসূল ﷺ এর উম্মীয়্যতকে অস্মানসূচক শব্দে বর্ণনা করে বলতে শোনা যায়- নবীজি ছিলেন ইল্লিটারেট! এবং হাদীস দ্বারা সমর্থিত ও উম্মতের গভীর আবেগে গ্রথিত রাসূল ﷺ এর রাওদা শরীফকে ‘রাওদা’ বলতে আপত্তি জানিয়ে কেউ বলেছেন- হাদীসের কোথাও নবীজির রাওদা শরীফকে ‘রাওদা’ বলা হয়নি, কবর বলতে হবে। তারা এখানে ক্ষান্ত না হয়ে পূর্ববর্তী নবীদের ব্যাপারেও যাচ্ছেতাই বলে চলেছেন। উসওয়ায়ে হাসানাহ রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, অন্য কোন নবীর মধ্যে উসওয়ায়ে হাসানা থাকার কথা বলা হয়নি- এটি উল্লেখিত ওয়াইযদেরই একজনের বক্তব্য। রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে এমন বক্তব্য স্পষ্টভাবেই বেয়াদবী।

রাসূলে পাক ﷺ এর ব্যাপারে কথা বলার সময় শিষ্টাচার রক্ষার ন্যূনতম ইলমী ঐতিহ্যগত যে প্রতিশ্রুতি একজন আলিমের থাকা দরকার, এর বিপরীতে উল্লিখিত বক্তাদের এমন বক্তব্য নিঃসন্দেহে স্খলন। রাসূল ﷺ এর জন্য অমার্যাদাকর ও তাঁর সুউচ্চ শানের সাথে বেমানান এমন কথার ছড়াছড়ি ঈমানদার মুসলমানের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক, বিরক্তিকর ও অনভিপ্রেত। এসব বক্তব্যের কিছু কিছু ভুল কিংবা অসতর্কতাবশত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পুনরাবৃত্তভাবে ও অকুণ্ঠচিত্তে যখন এ ধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয় এবং এটি যখন একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়, তখন এটিকে কেবল কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের বিভ্রান্তি বলে এ ব্যাপারে অধিকতর বিস্তৃত পর্যালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়া হলে এই সমস্যাটির মূল অনির্ণীত থেকে যাবে। রাসূল ﷺ এর ক্ষেত্রে শব্দচয়নের বেলায় এমন খামখেয়ালিপনার প্রেরণা কিসে, কেন উম্মাহর স্কলারদের হাজার বছরের অনুসৃত নীতিকে না মেনে বারবার অশোভন শব্দ/বাক্য প্রয়োগ করা হয় নবী-রাসূলদের বেলায়- এ ব্যাপারে সম্যক অনুসন্ধান এই সমস্যার শিকড় আবিষ্কারে সহায়ক হতে পারে।

এ দেশের সমসাময়িক ওয়াইয বা বক্তাদের যারা রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কথা বলার সময় আদবের প্রতি কদাচিৎ ভ্রুক্ষেপ করে ইসলামী জ্ঞান-ঐতিহ্যের শাসনসীমা লঙ্ঘন করে কথা বলে থাকেন, তাদের কেউ কেউ সালাফী-নজদী হলেও এদের একটি বড় অংশ ভারতীয় ইসলামচিন্তক মরহুম সাইয়িদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩খ্রি.-১৯৭৯খ্রি.) এর অনুসারী। মওদূদী সাহেব তার লেখায় নবী-রাসূলগণের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে খড়গহস্ত হয়েছেন ও তাদেরকে কোন কোন

বিশেষ সময়ে গুনাহমগ্ন কিংবা পথভ্রষ্ট হিসেবেও দেখাতে চেয়েছেন। এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাইদের অনুসারী উলামায়ে কিরাম তার ইসমতে আম্বিয়া (আ.) সংশ্লিষ্ট আকাইদবিরুদ্ধ বিভ্রান্তিকর বক্তব্যগুলোর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন এবং এসবের ইলমী খণ্ডনও করেছেন। মরহুম মওদূদী সাহেবের ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থানের ব্যাপারে ধারণা নেয়ার জন্য তার কিছু বক্তব্যের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

হযরত নূহ (আ.) চিন্তাধারার দিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে জাহিলিয়্যাতের জযবা স্থান পেয়েছিল (তাফহীমুল কুরআন)। হযরত দাঊদ (আ.) এর কাজের মধ্যে নফস ও আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথেও তার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরণের কাজ, যা হক পন্থায় শাসনকারী কোন মানুষের পক্ষেই শোভা পায় না (তাফহীমুল কুরআন)। নবী হওয়ার পূর্বে মূসা (আ.) এর দ্বারা একটি গুনাহ হয়েছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে কাতল করেছিলেন (রাসায়েল ও মাসায়েল)। নবীর আদত (অভ্যাস), আখলাককে (চরিত্র) সুন্নত বলা হয় এবং তা অনুসরণে জোর দেওয়া আমার মতে সাংঘাতিক ধরণের বিদআত (রাসায়েলে ও মাসায়েল)। মহানবী ﷺ নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ পোষণ করেছেন (তরজমানুল কুরআন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ঊর্ধ্বে নন এবং মানবীয় দূর্বলতা থেকেও মুক্ত নন (তরজমানুল কুরআন)।

সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদীর উপরোল্লিখিত বক্তব্যমালা ছাড়াও তার চিন্তার একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সমর্থিত বৌদ্ধিক-কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক একটি ধারা বা ঘরানার বিবর্তন ঘটিয়েছে। তার চিন্তাপ্রভাবিত এই ঘরানায় সবসময় তিনি মান্যবর হিসেবে বিবেচিত ও গৃহীত। কোন একটি ঘরানার শীর্ষ তাত্ত্বিকের পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য ও চিন্তার উৎপাদন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই এটির প্রভাব এর অনুসারীদের উপর পড়ে। মওদূদী-চিন্তার অনুসারী এই ঘরানাটির বেলায় সম্ভবত এটিই ঘটেছে। তারা রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কথা বলা, তাঁর বর্ণনা দান কিংবা তাঁর শানে শব্দপ্রয়োগের বেলায় আদবের ব্যাপারে নির্বিকার শিথিলতা প্রদর্শন করতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেন না, যেন তারা কোন এক বিশেষ কর্তৃত্ব থেকে এসবের জন্য অনুমোদিত।

অথচ মুসলিম উম্মাহর আবহমান জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারা আমাদেরকে বিপরীত নযীর সরবরাহ করে। উম্মাহর ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে যে কোন বাক্য বা শব্দ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে কোনরূপ উদাসীনতা ও অবহেলাকে প্রশ্রয় দেননি। রাসূল ﷺ এর মুবারক শানের জন্য মানানসই নয় এমন যাবতীয় কিছুকে তারা কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। ইমাম কাযী ইয়ায (র.) (৪৭৬ হি. -৫৪৪ হি.) তার 'আশ শিফা বি তারীফি হুকূকিল মুস্তাফা' গ্রন্থে বলেছেন-

...যে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে, তাঁর বংশ বা তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অথবা তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে কমতি তথা নুকসানিয়াতকে যুক্ত করে কিংবা এরকম কিছুর ইঙ্গিত করে, অথবা গালি, অপমান, হেয়, অবজ্ঞা ও কলঙ্ক সদৃশ কোন কিছুর সাথে তাঁকে তুলনা করে- সে রাসূল ﷺ কে গালি দাতা বলে বিবেচিত হবে। (আশ শিফা)[৩]

আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে ও তাঁর জন্য শব্দচয়নের বেলায় ইসলামী আকাইদ অনুসরণের পাশাপাশি ঈমানী প্রেরণাজাত আবেগকে সাড়া দেওয়ার দ্বিমাত্রিকতা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে বজায় রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রাসূল ﷺ এর সাথে নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর আত্মিক যোগাযোগ থেকেই তাঁরা এর প্রেরণা পেয়েছেন। রাসূল ﷺ এর শ্রেষ্ঠত্বে যেকোন ধরণের ঘাটতির বহিঃপ্রকাশ ঘটার দূরতম সম্ভাবনা রাখে এমন কিছুও তাঁর শানে বলা বা লেখা ঈমানের মেজাজবিরুদ্ধ, গর্হিত কাজ। সুতরাং রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কথা বলা বা লেখালেখির ক্ষেত্রে সালফে সালিহীন ও উম্মাহ স্বীকৃত ইমামদের বক্তব্য ও লেখনীরীতিতে আদবের আবহে নির্মিত ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত যে উত্তরাধিকার, এর অনুসরণ আমাদের জন্য হতে পারে কলম ও যবানকে স্খলন থেকে হিফাযতের রক্ষাকবচ।

---

১. ما سمعنا عن أحد منهم أنه ناقش النبي الله في كيف أكل آدم من الشجرة وكيف عصى ربه؟ وهذا القصص الذي هو أصرح شيء في وصف المعصية، ولا ناقشوا الرسول الله في غير آدم من الأنبياء على هذا المنحى الذى نحاه المتأخرون. (عصمة الأنبياء)

২. ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه؛ يا محمد، يا محمد. [ولكن قولا لينا وخطابا حسنا، بتعظيم له وتوقير وإجلال]؛ يا نبي الله، يا رسول الله. (تفسير الطبري)

৩. ... ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له.(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-

২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-

ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-

ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%,
ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও
এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

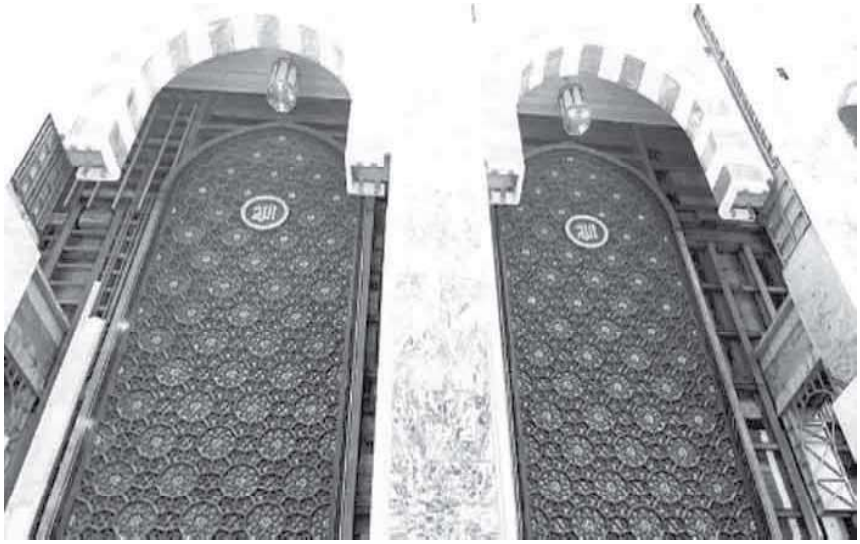
ভিজিট করুন
তাসনীম তাসনীম
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

ভূতখানা থেকে বেরিয়ে এলো কাবার প্রহরী

মাওলানা নজমুদ্দীন চৌধুরী

সাধারণতঃ বিজয়ীর ধর্ম বিজিতের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু আজ এখানে এমন এক বিজয়ী জাতির কথা বলব- যারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে বিজিতের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করেছিল। মানব সভ্যতা বিধ্বংসী যালিম চেঙ্গিস খানের বংশধররা কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরছি।

চেঙ্গিস খান ও তৎপৌত্র হালাকু খান সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা আবশ্যক। চেঙ্গিস খানের আমলে ভারত সীমান্ত থেকে বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের অধিপতি ছিলেন-মহা ক্ষমতাধর সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ খারিজমী। তার রাজ্যের সীমান্তবর্তী বাদশাহগণ মুহাম্মদ শাহকে ভীতির চোখে দেখতেন। মুহাম্মদ শাহের রাজ্যসীমা চেঙ্গিস খানের রাজত্বের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এহেন ক্ষমতাধর মহা পরাক্রম সুলতানের সাথে সদ্ভাবের উদ্দেশ্যে চেঙ্গিস খান বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ফলে-কারাকোরাম ও খারিজম সাম্রাজ্যের মাঝে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। কথিত আছে-একবার কারাকোরাম থেকে আগত এক ব্যবসায়ী দলকে গুপ্তচর সন্দেহে মুহাম্মদ শাহের জনৈক গভর্নর বন্দী করে সুলতানকে তা অবহিত করেন। সুলতান এ সন্দেহজনক দলটিকে হত্যার আদেশ দেন। চেঙ্গিস খান এ ঘটনায় আপত্তি জানিয়ে সুলতানের কাছে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সুলতান প্রতিনিধিদলের প্রধানকে হত্যার আদেশ দেন বলেও কথিত আছে। এরপর তাতারীরা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মুসলমান সালতানাতের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। প্রথমে বুখারা ধ্বংস করে শহরের সকল অধিবাসীদের হত্যা করে। সমরকন্দেরও একই অবস্থা হয়। ইসলামী জগতের বিখ্যাত শহর হামদান, কজউইন, মেরো ও নিশাপুরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। উপরে উল্লেখিত মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ যেভাবে ধ্বংস এবং মুসলিম অধিবাসীদের যেভাবে হত্যা করা হয়- মানবেতিহাসে এর নযীর কোথাও নেই। তাতারীদের কাছে হত্যার ব্যাপারে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, কোনো তফাৎ ছিল না। যে শহর তারা দখল করেছে, মানুষকে করেছে নির্বিচারে হত্যা। মুসলিম মনীষীদের শত শত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল অগণিত দুষ্প্রাপ্য ও মহামূল্যবান গ্রন্থরাজীর পাণ্ডুলিপি সব খড়কুটার মতো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ শাহ খারিজমী তার বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও রণকৌশলে ভুল করায় চরমভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যান এবং কোন এক অখ্যাত স্থানে ইন্তিকাল করেন। তার পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন আপ্রাণ চেষ্টা করেও সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।



> যেসব নিবেদিত প্রাণ মুসলমান ও মহান ব্যক্তির দ্বারা এ দুর্ধর্ষ যালিম কওম ইসলাম গ্রহণ করে, এদের মধ্যে কম লোকের নামই দুনিয়াবাসী জানে। তবে এদের কাছে শুধু মুসলমানই নয়; সমস্ত মানব জাতিই ঋণী।

চেঙ্গিস খানের পর তার পৌত্র হালাকু খান ইসলামী দুনিয়ার দারুল খিলাফত, সে কালের দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ নগরী, শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদে আক্রমণ চালিয়ে নগরীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। হালাকু খানের সময়ে বাগদাদের খলীফা ছিলেন মুতাসিম বিল্লাহ। তিনি ইবন আলকমী নামক কুখ্যাত চরমপন্থী শিআকে উযীর নিযুক্ত করেছিলেন। শিআ সম্প্রদায়ের লোকেরা সুন্নী মুসলমানদের পরম শত্রু হিসেবে মনে করে থাকে। আলকমীও সুন্নী মুসলমানের খিলাফত ধ্বংস করার সবরকম

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এ গাদ্দার হালাকু খানের কাছে পত্র লিখে বাগদাদ আক্রমণের আহবান জানায়। অন্যদিকে নাসিরুদ্দীন তুসী নামক এক কুখ্যাত শিআ হালাকু খানের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেও হালাকু খানকে যথাসাধ্য বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করতে থাকে। বাগদাদ ধ্বংসের ব্যাপারে উযীর আলকমী ও নাসিরুদ্দীন তুসী উভয়ের ভূমিকার কথা সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। এমনকি ইরানী জনৈক শিআ কর্তৃক লিখিত 'আখবার ও আসারে খাযা নাসিরুদ্দীন তুসী' নামক বইতেও বাগদাদ ধ্বংসের ব্যাপারে নাসিরুদ্দীন তুসীকে দায়ী করা হয়েছে।

বাগদাদ ধ্বংস এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। এর সামান্য নমুনা পাঠক সমক্ষে উপস্থাপন করছি। ইবন কাসীর (র.) 'বিদায়া ওয়ান নিহায়া' কিতাবে লিখেছেন- বাগদাদে চল্লিশ দিন একাধারে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। চল্লিশ দিন পর পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এ শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। রাস্তায়-বাজারে সবখানে লাশের উপর লাশ পড়ে টিলার মতো দেখাচ্ছিল। তারপর বৃষ্টির পানি পড়ে এসব লাশ পচে গলে মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়ায়। ফলে শহরের আবহাওয়া দূষিত হয়ে মহামারী দেখা দেয়। দূষিত বায়ু ও মহামারীতে বহু লোক মারা যায়। হত্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এ তিনের সমন্বয়ে বাগদাদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। আল্লামা তাজুদ্দীন সুবুকী (র.) এর বর্ণনায়-হালাকু খান বাগদাদের খলীফা মুতাসিম বিল্লাহকে এক তাবুতে রাখে। উযীর ইবন আলকমী শহরের উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে এ মর্মে আহবান করে যে, খলীফা ও হালাকু খানের সন্ধিপত্রে তারা সাক্ষ্য দিবেন। এসব লোক উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলা হয়। এভাবে একদল একদল করে আনা হয় ও হত্যা করা হয়। তারপর খলীফার বিশেষ অমাত্য ও পরিষদবর্গের লোকদের ডেকে এনে সবাইকে হত্যা করা হয়। খলীফা তখনও জীবিত ছিলেন। খলীফার রক্তপাতে অনিষ্টের আশংকা ভেবে হালাকু কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নাসিরুদ্দীন তুসী (শিআ) বললো কোন অসুবিধা নেই। খলীফার রক্তপাত না করে অন্যভাবে তাকে হত্যা করা যাবে। অতঃপর খলীফাকে বিছানা দিয়ে লেপ্টে ধরে লাথি ও ঘুসি মেরে হত্যা করা হয়। (ইন্না লিল্লাহি..... রাজিউন)

তাতারীরা শুভ অশুভ গণনায় খুব বিশ্বাস করতো । হালাকু খানের দরবারে হুসামুদ্দীন নামক এক গণক ছিলেন। বাগদাদ আক্রমণের শুভ অশুভ সম্বন্ধে হালাকু উক্ত গণককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন-এ সময়ে বাগদাদ আক্রমণ করা অশুভ। যখনই কোনো বাদশাহ খিলাফত ধ্বংসের কাজে হস্তক্ষেপ করেন তখনই বিপদগ্রস্ত হন। যদি আপনি বাগদাদ আক্রমণ করেন, তবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। ঝড়-তুফান ও ভূমিকম্পে দুনিয়ার একাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি বাদশাহ সনকু খান (তাতারী সম্রাট) মারা যাবেন। হালাকু খান এতদশ্রবণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ উক্ত মুসলমান গণক ব্যক্তি বাগদাদের অধিবাসীদের প্রাণ রক্ষার্থে উক্ত গণনার অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নাসিরুদ্দীন তুসী (শিআ) হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের পক্ষে অনেক যুক্তি দিল। সে বললো যুদ্ধে অনেক সাহাবা শহীদ হয়েছেন, কিন্তু এতে যমীনে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি হয়নি। যদি আব্বাসীয়দের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তবে এর উত্তর হচ্ছে- আব্বাসীয় খলীফা মামুনের আদেশে আমীনকে হত্যা করা হয়েছে। মুতাওয়াক্কিল তাঁর দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন।

মুনতাসির এবং মুতাদ্দিদকেও হত্যা করা হয়েছে। এতে তো কোন ভূমিকম্প বা তুফান হয়নি। মোটকথা শেষ পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন তুসীর কথাই হালাকুর মনোপুত হলো। আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহকে হত্যার ব্যাপারে তার মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। হালাকু খান বাগদাদের নিহত মানুষের লাশ গণনা করার আদেশ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় আঠার লক্ষ। পঁচিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আঠার লক্ষ কতল হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক নিহতের সংখ্যা এরচেয়ে কিছু কম বলে বর্ণনা করেছেন। বাগদাদের পর তাতারীদের হাতে হলব ও দামেস্ক বিধ্বস্ত হয়।

দামেস্কের খ্রিষ্টান অধিবাসীরা তাতারীদের স্বাগত জানায় ও মুসলমানদের ধ্বংস দৃশ্যে অত্যন্ত খুশি হয়। এ সুযোগে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে খ্রিষ্টানরা মদ ছিটায় ও উল্লাস করে। অতঃপর তাতারীরা মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মিশরের সুলতান মালিক মুজাফফর সাইফুদ্দীন ভাবলেন এবার মিশরের পালা। যদি তাতারীরা মিশর আক্রমণ করে তবে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং আগেভাগে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে তাতারীদের উপর হামলা করা উচিৎ। ২৫ শে রামাদান ৬৫৮ হিজরী আইনে জালূত নামক স্থানে মিশরীয় বাহিনীর সাথে তাতারীদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী জয়লাভ করে। ইতিহাসে আইনে জালূতের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অজেয় তাতারী বাহিনী এই যুদ্ধে প্রথম মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজয়বরণ করে। আইনে জালূতের যুদ্ধের পর মালিক জাহির বাইবার্স কয়েকবার তাতারীদের পরাস্ত করেন এবং তাদেরকে বিতাড়িত করেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র মিশরীয় সুলতানের রাজত্ব ছাড়া এবং ভারতের মুসলিম রাজত্ব ছাড়া কারাকোরাম থেকে মিশর সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগ তাতারীদের দখলে চলে গিয়েছিল। তারা তখন বিজয়ী। ধর্মের ব্যাপারে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করার ক্ষমতা মুসলমানদের ছিলো না। কিন্তু আল্লাহর অপূর্ব মহিমায় তাতারীরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করল।

মনে রাখা আবশ্যক যে, তাতারীরা মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার ছিল। তাদের সব আক্রোশ ছিল মুসলমানদের উপর। দামেস্ক বিজয়ের সময় তথাকার খ্রিষ্টানরা তাতারীদের স্বাগত জানায়। মুসলিম নিধন দেখে উল্লাস প্রকাশ করে। এদিকে মুসলমানরা তখন বিপর্যস্ত, পরাজিত তাতারীদের চোখে একান্ত হেয়। এহেন অবস্থায় তাদের মাঝে ইসলামের প্রসার এক অস্বাভাবিক ঘটনা। মোটকথা তখনকার অবস্থা ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে মোটেই অনুকূল ছিলো না।

প্রফেসর আরনল্ড বলেন, অবশেষে ইসলাম তার অতীত শান-শওকত নিয়ে ধ্বংসস্তুপ থেকে জেগে উঠল। মুসলমান মনীষীগণ এ বর্বর জাতিকে যারা মুসলমানদের উপর কোনো যুলমই বাকী রাখেনি- তাদেরকেও মুসলমান করে ফেললো, এ কাজটি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। কারণ দুটি ধর্মের লোক (বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান) এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, যাতে তাতারদের নিজ ধর্মে বিশ্বাসী করে তোলে। ইসলামের জন্য এ সময় বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্মের মুকাবিলা করে মুঘলদের (তাতারীদের) এ উভয় ধর্ম থেকে বাঁচিয়ে ইসলামে দীক্ষা দেওয়া এমন কাজ ছিলো যাতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করা হতো। মুঘলদের (তাতারী) এ প্রলয়ংকারী ধ্বংসে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য ধর্মের প্রতি মুঘলরা ছিল উদার, ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ছিল অত্যন্ত বেশি। চেঙ্গিস খান হুকুম দিয়েছিল-যে সমস্ত মুসলমান শরীআত মুতাবিক পশু জবাই করবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। কুবলাই খানের রাজত্বকালে উক্ত হুকুমটি নতুনভাবে আবার জারী করা হয়। ফলে অসংখ্য মুসলমান এ অপরাধে নিহত হন। কিউক খানের আমলে (১২৪৬-১২৪৮খ্রি.) দু'জন খ্রিষ্টান উযীরের হাতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ছিল। এ সময় মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। আরগুণ খান (১২৮৪-১২৯১খ্রি.) এর আমলেও মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলে। এতসবের পরও এ বর্বর জাতি সেই মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করল; অথচ তাদের তারা পদানত করেছিল।

যেসব নিবেদিত প্রাণ মুসলমান ও মহান ব্যক্তির দ্বারা এ দুর্ধর্ষ যালিম কওম ইসলাম গ্রহণ করে, এদের মধ্যে কম লোকের নামই দুনিয়াবাসী জানে। তবে এদের কাছে শুধু মুসলমানই নয়; সমস্ত মানব জাতিই ঋণী।

তাতারীদের প্রথম যে বাদশাহ মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর নাম বোরকা খান। তিনি চেঙ্গিস খানের পৌত্র ও জুজী খানের পুত্র। চেঙ্গিস বংশের দ্বিতীয় শাখা ইলখানী বংশে প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন তাগুদার। তিনি হালাকু খানের পৌত্র। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আহমদ। তিনি শাইখ কামালুদ্দীন আব্দুর রহমান রাফিযীকে উযীর নিযুক্ত করেছিলেন। আহমদ খানের ইসলাম গ্রহণে তার ভাই আরগুণ খান অতিশয় রুষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় । ফলে আহমদ খান মাত্র তিন বৎসর রাজত্বের পর বন্দী হয়ে ৬৮৩ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেন। বাল্যকালে তাগুদারকে (আহমদ) খ্রিষ্ট ধর্ম মুতাবেক শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু বড় হয়ে তাগুদার ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইলখানী বংশের সপ্তম বাদশাহ গাজান খান ইসলাম গ্রহণ করেন। গাজান খানের শিক্ষা-দীক্ষা বৌদ্ধ ধর্মানুসারে দেওয়া হয়। ফলে প্রথমদিকে গাজান খান অনেক বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য ধর্মমত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন এবং একপর্যায়ে আমীর তুজুন (র.) এর হাতে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

কাশগড়ের বাদশাহ তুঘলক তৈমুর মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, একবার বুখারা থেকে এক বুযুর্গ শাইখ জালালুদ্দীন (র.) একদল ভক্তসহ সফরে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তুঘলক তৈমুরের সংরক্ষিত শিকারের স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তৈমুরের সেনারা এ কারণে তাঁদের সকলকে বন্দী করে বাদশাহর দরবারে হাযির করে। তুঘলক তৈমুর অত্যন্ত গোস্বা ভরে শাইখ জালালুদ্দীন (র.)কে জিজ্ঞেস করেন- আমার সংরক্ষিত শিকারের ভূমিতে তোমরা কেন প্রবেশ করেছো? শাইখ উত্তর দিলেন আমরা বিদেশি মানুষ। আমাদের জানা ছিলো না যে এ ভূমি দিয়ে চলা নিষিদ্ধ। কথাবার্তায় বাদশাহ যখন জানতে পারলেন, এরা ইরানী। তখন বললেন, ইরানীদের চেয়ে কুকুরই উত্তম। শাইখ অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দিলেন তা সত্য, যদি আমরা সত্যধর্মের অনুসারী না হতাম তবে কুকুরের চেয়ে অধম ছিলাম। এ কথাটি তৈমুরের মনে খুব দাগ কাটল। তিনি রক্ষীদের আদেশ দিলেন এ বন্দীকে আমি শিকার থেকে ফেরার পর আমার কাছে হাযির করবে। বাদশাহ শিকার থেকে ফিরে আসলে শাইখ জালালুদ্দীন (র.) কে তাঁর দরবারে পেশ করা হলো। বাদশাহ তৈমুর প্রশ্ন করলেন তুমি আগে যে কথাটি বলেছিলে, এখন তার ব্যাখ্যা দাও। সত্য ধর্ম বলতে তুমি কী বুঝাতে চাও? শাইখ জালালুদ্দীন (র.) ইসলাম সম্বন্ধে এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করলেন যা শুনে পাষাণ হৃদয় তাতারী বাদশাহ তৈমুর অভিভূত হলেন। সত্যের আলোকে যাদের অন্তর উদ্ভাসিত এদের কথা মানুষের মরমে না পৌঁছে পারে না। সিদ্ধ পুরুষ জালালুদ্দীন (র.) এর কথা বাদশাহর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি বললেন, এখন আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ হলে প্রজাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। অতিসত্বর আমি আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হব। তখন আপনি আমাকে সাক্ষাৎ দিবেন। অনেকদিন পরের কথা। শাইখ জালালুদ্দীন (র.) তার জন্মভূমিতে এসে ভীষণ অসুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময়, নিকটবর্তী হলে পুত্র রাশিদুদ্দীনকে বলেন তুঘলক তৈমুর একদিন বড় বাদশাহ হবে, তখন তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলবে আমার সাথে তার কী ওয়াদা ছিল। পিতার ইন্তিকালের পর রাশিদুদ্দীন ওসীয়ত মুতাবিক বাদশাহর ছাউনিতে পৌঁছে অনেক চেষ্টা করে বাদশাহর সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি একদিন ফজরের সময় তৈমুরের তাবুর পাশে আযান দেন। আযান শুনে সিপাহীরা তাকে ধরে রাজদরবারে নিয়ে গেল। রাশিদুদ্দীন নিঃশঙ্কচিত্তে তৈমুরের কাছে পিতার খবর পৌঁছালেন। তুঘলক তৈমুর তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

আরনল্ড বলেন- সমস্ত মুঘল (তাতারী) সাম্রাজ্যের সবখানেই এমন মুসলমান ছিল- যারা বিধর্মীকে সংগোপনে মুসলমান করে ফেলতো। উকতাই খানের আমলে ইরানের গভর্নর কিরখিজ- যিনি প্রথমে বৌদ্ধ হয়েছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মোটকথা, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাতারীদের সকলে ইসলাম গ্রহণ করে। যারা মুসলিম নিধন ও মুসলিম সভ্যতার উৎখাতকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তারা শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান হয়ে যাওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম নিজ দুশমনকেও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে একান্ত আপন করে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। যারা একদিন ধরাপৃষ্ঠ হতে ইসলামের নামকে মুছে ফেলতে হয়েছিল বদ্ধপরিকর তাদের বংশ থেকেই বড় বড় মুসলমান বাদশাহ, ফকীহ, আলিম ও মুজাহিদ পয়দা হলো। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছিলেন- ভূতখানা থেকে বেরিয়ে এলো কাবার প্রহরী।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান

সিরাজাম মুনিরা লতিফিয়া মাদরাসা

SIRAJAM MUNIRA LATIFIA MADRASAH

স্থাপিত: ২০২৪ইং

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিফযুল কুরআন।
* হিফজের পাশাপাশি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* নাহু সরফ বিষয়ে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা।
* ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা সমন্বিত সিলেবাস।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* অনলাইনের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার দ্বারা বিশেষ পাঠদান।
* সুন্নাতে নববীর অনুসরণ ও উত্তম চরিত্রের উপর গুরুত্বারোপ।
* সুন্দর মননের জন্য সাপ্তাহিক সভা, বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস উদযাপন।
* গরীব, ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।
* সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

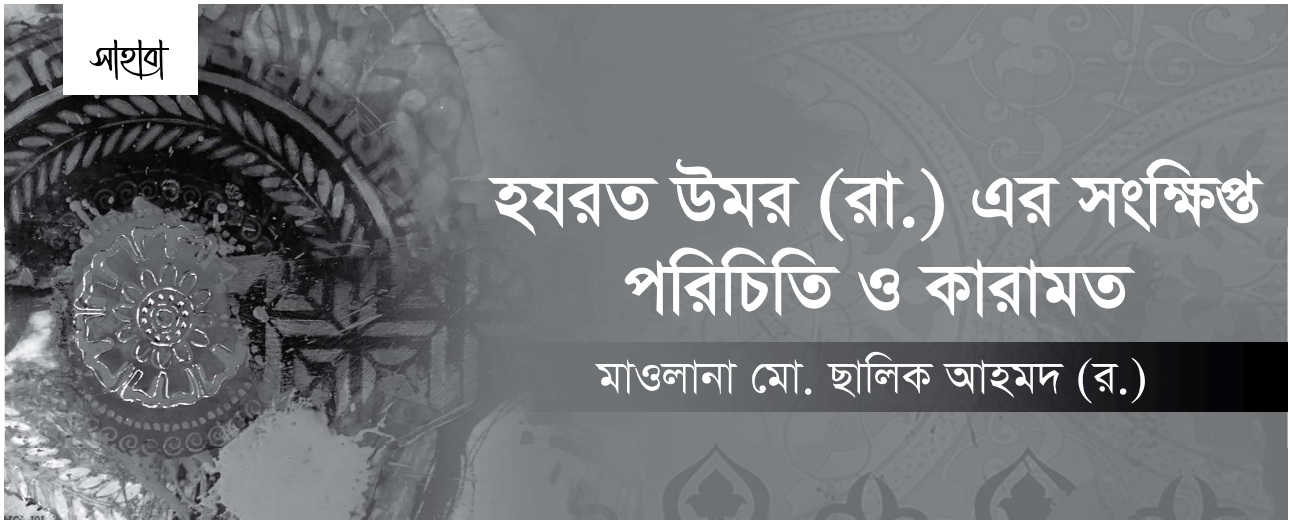
আবাসিক অনাবাসিক

ভর্তি চলছে

যোগাযোগ

মাওলানা মো: ইয়াকুব আলী
প্রিন্সিপাল
মোবাইল: 01715-526279

সোনাপুর, কালেঙ্গা রোড, মৌলভীবাজার সদর। মোবাইল: ০১৩১৮-৫২৮২৫৭



সাহাবা

হযরত উমর (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)

নাম উমর, পিতার নাম খাত্তাব। কুনিয়াত বা উপনাম আবূ হাফস। উপাধি আল ফারুক ও আমীরুল মুমিনীন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ মতান্তরে পঞ্চম বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, চল্লিশজন পুরুষ এবং এগারোজন মহিলার ইসলাম গ্রহণের পর। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্যদিয়েই ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষদের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হয়েছে। হযরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্যদিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। তিনি দারে আরকামে রাসূলে পাক ﷺ এর দরবারে যখন কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম কবূলের ঘোষণা দেন, তখন সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম এত জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলেছিলেন যে তাকবীরের আওয়াজ মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই মহানবী ﷺকে প্রশ্ন করেন, আমরা কি সত্যের উপর নই? রাসূলে পাক ﷺ জবাব দিলেন, শপথ সেই সত্তার, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমরা অবশ্যই সত্যের উপর আছি। হযরত উমর (রা.) ঘোষণা করলেন, তাহলে গোপনে কেন, চলুন আমরা প্রকাশ্যে গিয়ে কাবার আঙিনায় নামায আদায় করব। রাসূলে পাক ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে দুই সারিতে বিভক্ত করে বেরিয়ে পড়লেন। এক সারির প্রধান 'সায়্যিদুস শুহাদা' হযরত হামযা (রা.) এবং অপর সারির প্রধান হযরত উমর (রা.)। কুরাইশের নেতৃস্থানীয় কাফির-মুশরিকদের উপস্থিতিতেই তাঁরা প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গণে নামায আদায় করলেন। রাসূলে পাক ﷺ তখনই হযরত উমর (রা.) কে 'ফারুক' লকবে ভূষিত করেন। তিনিই ইসলামের প্রথম ব্যক্তি যাকে 'আমীরুল মুমিনীন' খিতাবে ভূষিত করা হয়। অনেক বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত মুতাবিক পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি দশ বছর ছয় মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) এর অগ্নিপূজক ক্রীতদাস আবূ লুলু তাকে মারাত্মক আঘাত করে। আর এ আঘাতের কারণেই শাহাদাতবরণ করেন। চব্বিশ হিজরী সনের মুহাররাম মাসের দশ তারিখ রবিবার দিন রাসূলে খোদা ﷺ এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি ছিলেন ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলীফা।

তাঁর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীস

তাঁর বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে দুটো হাদীস উল্লেখ করা হলো।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ، اِمْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلتُ: مَن هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا بِلَالٌ، ورَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلتُ: لِمَن هٰذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فأرَدْتُ أَنْ أدْخُلَهُ فأنْظُرَ إلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتِ وأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أغَارُ. (متفق عليه؛ مشكوة، ص–٥٥٧)

-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমি মিরাজের রাত্রে জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখলাম আবূ তালহা (রা.) এর স্ত্রী রুমাইসাকে (হযরত আনাস রা. এর মাতা উম্মু সুলাইম রা. এর মূল নাম)। এমতাবস্থায় কারো জুতার আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে ভেসে উঠল, আমি জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন, বিলাল। অর্থাৎ বিলাল (রা.) এর জুতার ধ্বনি শুনেছেন। তখন আমি একটি অট্টালিকা দেখতে পেলাম যার আঙিনায় একজন কিশোরী রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ অট্টালিকা কার? তিনি বললেন, এটা উমর ইবন খাত্তাবের। তখন সেখানে প্রবেশ করে দেখতে আমার ইচ্ছা হলো, কিন্তু (হে উমর!) এ সময় তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে হলো (তাই আমি তা করিনি)। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি আমার আত্মমর্যাদাবোধ চলে? (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৫৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. رواه الترمذى وفى رواية الى داود عن أبي ذر قال إِنَّ اللهَ وَضَعَ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ يَقولُ به. (مشكوة، ص–٥٥٧)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হযরত উমর (রা.) এর মুখে ও অন্তরে হক রেখে দিয়েছেন অর্থাৎ তার জবান দিয়ে আল্লাহ সত্য প্রকাশ করেন। (তিরমিযী) আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে অনুরূপ এক বর্ণনায় রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হক হযরত উমর (রা.) এর জিহ্বায় রেখে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে তিনি (উমর) কথা বলেন। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৫৭)

হযরত উমর (রা.) এর কারামত

● ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম করা হতো। আর আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন হযরত উমর (রা.)। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো হযরত উমর (রা.) ইলহামের অধিকারী ছিলেন। আর তার এ গুণ কারামতেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অন্যতম কারামত হলো, তাঁর মত আল্লাহর ওহী এবং কিতাবের সাথে মিলে যেত। প্রায় বাইশটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) এর ফয়সালা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত কিংবা আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে।

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) হযরত সারিয়া (রা.) এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। একদা হযরত উমর (রা.) মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফে খুতবা প্রদানরত অবস্থায় তিনবার "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে মনোনিবেশ করো" কথাটি উচ্চারণ করলেন। কিছুদিন পর যখন উক্ত বাহিনীর কোনো একজন দূত মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন হযরত উমর (রা.) তাঁর নিকট যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দূত জবাব দিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার উপক্রম ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনবার আমরা يَا سَارِيَةُ الْجَبَل এ আওয়াজটি শুনতে পেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের দিকে সরে গিয়ে পাহাড়ে আমাদের পৃষ্ঠদেশ ঠেস লাগিয়ে দিলাম এবং আল্লাহ পাক শত্রুদেরকে পরাজিত করে আমাদের বিজয় দান করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন, তখন লোকেরা হযরত উমর (রা.) কে বললেন, আপনি জুমুআর দিন মধ্যখানে এ আওয়াজ দিয়েছিলেন। এই পাহাড় যার নিকটে হযরত সারিয়া (রা.) ও তাঁর বাহিনী অবস্থান করেছিল তা প্রাচ্যের ভূখণ্ড নেহাওন্দ (সিরিয়ায়) নামক স্থানে ছিল (যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় সাতশত মাইল দূরে অবস্থিত)।

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ الاصابة فى تميز الصحابة নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে এর সনদ হাসান পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।

তাছাড়া মিশকাত শরীফে ইমাম বাইহাকী (র.) এর দালাইলুন নাবুওয়াত গ্রন্থের রেফারেন্সে হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) একদল সৈন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যে (সিরিয়ায় নেহাওন্দ নামক স্থানে) প্রেরণ করলেন এবং তাদের বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত সারিয়া নামক জনৈক সাহাবীকে। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববীতে খুতবা দান করছিলেন হঠাৎ يا سارى الجبل বলে চিৎকার করে উঠলেন। অর্থাৎ 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে মনোনিবেশ করো'। তখন আমরা আমাদের পৃষ্ঠদেশ পাহাড়ের গায়ে ঠেস লাগিয়ে দিলাম ফলে আল্লাহ পাক শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে দিলেন। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৪৬)

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? সেই ব্যক্তি উত্তর দিল جمرة অর্থাৎ (প্রজ্জ্বলিত কয়লা)। তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার পুত্র? লোকটি উত্তর দিল ابن شهاب অর্থাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ছেলে। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? জবাব দিল حرقة অর্থাৎ (পুঁড়া)। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাসস্থান কোন এলাকায়? জবাব দিল حرة অর্থাৎ প্রচণ্ড উষ্ণ এলাকায়। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, হাররার কোন অংশে তোমার বসবাস? সে জবাব দিল ذات لظى অর্থাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেষ্টিত এলাকায়। তা শ্রবণ করে হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যাও এবং গিয়ে দেখ তোমার পরিবার-পরিজন সব জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। লোকটি ফিরে গিয়ে সত্যিই তার পরিবার-পরিজনকে ভস্ম পেল। এ ঐতিহাসিক আশ্চর্যজনক ঘটনাটি আবুল কাসিম বিন বিশরান তার فوائد নামক গ্রন্থে, হযরত ইমাম মালিক (র.) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এর বর্ণনায় 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে, ইবন দুরাইদ তার الاخبار المشهورة গ্রন্থে এবং ইবন কালবী তার الجامع গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তারীখুল খুলাফা)

● হযরত আবুশ শাইখ তাঁর রচিত 'আল ইসমা' কিতাবে হযরত কাইস ইবন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন মুসলমানগণ মিশর বিজয় লাভ করলেন, তখন সেখানে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। একদা মিশরবাসী একটি প্রতিনিধি দল তাদের অনারবী মাস অর্থাৎ ইংরেজি বর্ষের কোনো এক মাসের প্রথম তারিখে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর দরবারে আগমন করে বলল, হে গভর্নর! আমাদের নীল নদ সম্পর্কে একটি প্রথা চালু রয়েছে যা পালন না করলে নীল নদে পানি প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? তারা বললেন, যখন এ মাসের এগারো তারিখের রাত অতিবাহিত হবে তখন প্রতি বছর আমরা একজন যুবতী কুমারী মেয়েকে তার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করে খুব ভালো পোশাকাদি ও চমৎকার অলংকারাদি পরিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়ে নীল নদে বিসর্জন দিয়ে থাকি। তখন নীল নদ পানি প্রবাহিত করে থাকে। হযরত আমর ইবন আস (রা.) তা শ্রবণ করে বললেন, ইসলাম এটি কখনো সমর্থন করে না। কেননা ইসলাম পূর্বের সকল কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। এটা শুনে মিশরীয়রা তা থেকে বিরত থাকল। কিন্তু নীল নদ পানি প্রবাহ করা থেকে বিরত থাকল। এজন্য মিশরের লোকেরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার মনস্থ করল। (কারণ নীল নদ প্রবাহিত না হলে মিশরে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যাবতীয় বিষয় উল্লেখপূর্বক আমীরুল মুমিনীন উমর (রা.) এর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করলেন। উত্তরে হযরত ফারুকে আযম (রা.) লিখলেন, হে আমর ইবন আস! আপনি যা করেছেন সবই ঠিক করেছেন। কেননা ইসলাম জাহিলী যুগের সকল কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। তিনি হযরত আমর ইবন আস (রা.) এর নিকট লিখলেন, আমি পত্রের ভিতর একটি চিরকুট আপনার নিকট প্রেরণ করছি, এটি নীল নদে নিক্ষেপ করবেন।

আমীরুল মুমিনীন উমর (রা.) এর প্রেরিত পত্রখানা যখন মিশরে হযরত আমর (রা.) এর নিকট আসল, তিনি তা খুলে পাঠ করলেন এবং ভিতরে নীল নদের নিকট লিখা চিরকুটটিও খুললেন ও পাঠ করলেন। উক্ত পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ, 'আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মুমিনীন উমর এর পক্ষ থেকে মিশরের নীল নদের নিকট হামদ ও সালাতের পর– যদি তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকো তাহলে তোমার প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তাহলে এক আল্লাহ যিনি কাহহার তার সমীপে দুআ করি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন।' হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) صليب নামক তারকা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের রাতে এ (বিস্ময়কর) পত্রখানা নীল নদে নিক্ষেপ করলেন। (সুবহানাল্লাহ) পরবর্তী দিন ভোরবেলা

লোকেরা স্বচক্ষে দেখতে পেল যে, নীল নদের পানি ষোল হাত উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক (হযরত উমর (রা.) এর পত্রের ওয়াসীলায় নদী প্রবাহিত করে দিয়ে) মিশরবাসীদের সে কুপ্রথা আজ তথা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৯০-৯১)

উক্ত ঘটনাটি খলীফা উমর (রা.) এর একটি জীবন্ত কারামত। মানুষ যখন আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হয়ে যায় তখন আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতকে তার অধীনস্থ করে দেন। তাইতো বলা হয় من له المولى فله الكل অর্থাৎ জিসকা রব উসকা সব।

● হযরত ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব আল খাজায়ী (র.) বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, একদা হযরত উমর (রা.) জনৈক যুবকের কবরের পাশ দিয়ে যাত্রাকালে বলেছিলেন, হে অমুক! যে তার রবকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটো জান্নাত। তখন কবরের ভিতর থেকে উক্ত যুবক হযরত উমর (রা.) কে ডেকে বলে, হে উমর! আমার রব আল্লাহ তাআলা আমাকে এ দুটি জান্নাত দুবারই প্রদান করেছেন। (কুররাতুল আইনাইন, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮)

হাফিযে হাদীস ইবন আসাকির (র.)ও উক্ত ঘটনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন।

● হযরত মা'দান বিন আবূ তালহা (রা.) থেকে এক দীর্ঘ ঘটনায় রয়েছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একদা বললেন, হে লোক সকল! আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, একটি লাল মোরগ আমাকে দুটো ঠুকর মেরেছে। এর দ্বারা আমি মনে করি আমার মৃত্যু একেবারেই সন্নিকটে। এ ঘটনাটি ইবন আবূ শাইবাও বর্ণনা করেছেন। (কুররাতুল আইনাইন, পৃষ্ঠা ১০৩)

বাস্তবেই দেখা গেল এ স্বপ্ন বর্ণনা করার কিছুদিনের মধ্যেই হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) এর ক্রীতদাস অগ্নিপূজক আবূ লুলু আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) কে নামাযরত অবস্থায় আঘাত করল এবং এ আঘাতের কারণেই তিনি শাহাদাতবরণ করলেন।

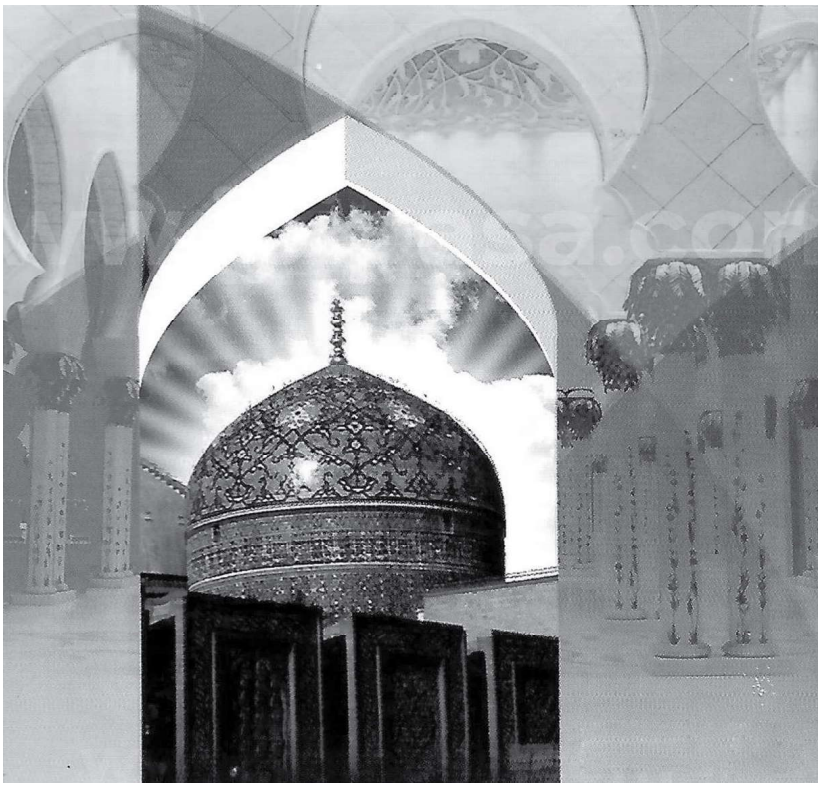
● মুহাম্মদ বিন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলে পাক ﷺ এর গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন কুরাইশের কতিপয় মহিলা মহানবী ﷺ এর দরবারে উচ্চ আওয়াজে বাক্যালাপ করছিলেন। যখন হযরত উমর (রা.) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন তারা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। রাসূলে পাক ﷺ হযরত উমর (রা.) কে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করে রাসূল ﷺকে হাস্যরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে পাক ﷺজবাব দিলেন আমি এ সকল মহিলাদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করলাম যারা আমার নিকট অবস্থান করছিল, এমতাবস্থায় তোমার আওয়াজ শুনে তারা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের তো আপনাকে বেশি ভয় করা উচিত ছিল। অতঃপর উমর (রা.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে নিজেদের উপর অত্যাচারকারিনী মহিলারা! তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ মহানবী ﷺকে ভয় কর না। জবাবে তারা বললেন, আপনি রাসূলে পাক ﷺ এর চেয়ে অধিক কঠোর। তখন রাসূলে পাক ﷺ বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই হে ইবনুল খাত্তাব! শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে রাস্তা দিয়ে বিচরণ করো সে রাস্তা দিয়ে শয়তানও চলে না। সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলাচল করে।

হযরত উমর (রা.) কে শয়তানের এ ধরনের ভয় করা তার সুস্পষ্ট কারামত ছাড়া আর কিছুই নয়। (সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২০)

● হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (স্বীয় পিতা উমর রা. সম্পর্কে বলেন) যে, উমর (রা.) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কোনো সময়ে তিনি কোনো ধারণা বা অনুমান করলে আমি কখনো তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি। একদা উমর (রা.) বসেছিলেন। তাঁর নিকট দিয়ে একজন সুশ্রী মানুষ পথ অতিক্রম করল। তিনি তার সম্পর্কে বললেন, আমার ধারণা অবাস্তব না হলে ঐ ব্যক্তি অমুসলিম হবে; আর যদি সে এখন মুসলমান হয়েই থাকে তবে সে পূর্বে নিশ্চয়ই গণক (জিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এ মন্তব্য করে তিনি লোকটিকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তাকে ডেকে আনা হলো। তিনি তার সম্মুখেও উক্ত মন্তব্য করলেন। সেই ব্যক্তি বললেন, একজন মুসলমানকে এরূপ অমুসলিম সন্দেহ করা সঙ্গত কি? অর্থাৎ আমি তো মুসলমান। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে কসম দিয়ে বললেন, বল তো তুমি পূর্বে কী ছিলে? সে বলল, আমি পূর্বে গণক ছিলাম। উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে জিনটির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় তোমাকে কী জানিয়েছিল? তিনি বললেন, একদা আমি বাজারে ছিলাম, আকস্মাৎ সে জিনটি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হলো এবং বলল, তুমি জানো কি? জিনগণ এক ভীষণ দূরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে (তারা দীর্ঘকাল মানুষ জাতিকে নানা প্রকার গর্হিত কাজে লিপ্ত রেখে স্বৈরাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছিল সে অবস্থা আর তারা বিরাজমান রাখতে পারবে না বলে) তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাদের দুর্দিনের সূচনা হয়েছে, ফলে তারা নিজেদের সবকিছু গুটিয়ে (সাধারণ লোকালয় হতে অনাবাদ এলাকার দিকে) দ্রুত পালাবার চেষ্টায় লেগে গিয়েছে।

হযরত উমর (রা.) ঘটনা শ্রবণান্তে বললেন, তোমার জিনটি তোমাকে যে নতুন পরিস্থিতির খবর দিয়েছিল তা সত্যই ছিল। আমারও (ইসলাম পূর্বের) অনুরূপ একটি ঘটনা রয়েছে। একদা আমি মূর্তি ঘরে শুয়েছিলাম। এক ব্যক্তি এসে মূর্তিগুলোর সামনে একটি গো-শাবক বলিদান করল। তখন বিকট আওয়াজে একটি ঘোষণা শুনতে পেলাম- তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনো শুনিনি। সেই ঘোষণাটি ছিল এই- হে জালীহ! একটি সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হয়েছে। এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যার ঘোষণা হবে- لا اله الا الله অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। উক্ত আওয়াজে ভয়ে উপস্থিত লোকজন সকলেই ছুটাছুটি করতে লাগল। (উমর রা. বলেন) তখন আমি মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করলাম, এ ঘোষণাটির তথ্য সঠিকরূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত আমি এর পিছনে লেগে থাকব। কিছু সময় আমি সেখানেই অপেক্ষা করলাম এবং পুনরায় ঐরূপ বিকট আওয়াজের ঘোষণা শুনলাম, হে জালীহ! সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হয়ে গিয়েছে। সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যার ঘোষণা হবে- لا اله الا الله অতঃপর আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। অল্প দিনের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল (হযরত মুহাম্মদ ﷺ) নবীর আবির্ভাব হয়েছে। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৪৬)

উক্ত ঘটনায় হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণাপ্রসূত যা বলেছিলেন তা সরাসরি মিলে গিয়েছিল। সুতরাং তা তাঁর সুস্পষ্ট একটি কারামত।



বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.)

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

(পূর্ব প্রকাশের পর)

খ. শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে ইন্তিকাল (৫২১- ৫৬১ হিঃ)

শিক্ষাগ্রহণ ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় পরম উৎকর্ষের পর শাইখ জিলানী (র.) যখন শিক্ষাদান ও ওয়াযের জন্য জনসম্মুখে আসলেন, ততদিনে তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু অতি অল্প সময়ের ভেতরেই তাঁর খ্যাতি পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশ এমনকি ভিন্ন মহাদেশ থেকেও তাঁর কাছে হিদায়াতপ্রত্যাশী মানুষেরা আসা শুরু করলো। উসতায আবূ সাদ মুখাররামীর ইন্তিকালের পর জিলানী (র.) তাঁর মাদরাসার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু লোকজনের ভীড়ে মাত্র সাত বছর পরেই ৫২৮ হিজরীতে সেই মাদরাসা আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণ করতে হলো। কিন্তু এটাও লোকের ভীড় সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি শহরের একটি ময়দানে প্রতি বুধবার সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করলেন। এতেও যখন স্থান সংকুলান হলো না, তিনি শহরের বাইরে একটি বড় ময়দানে আলোচনা শুরু করলেন। এটা পর্যায়ক্রমে মুসাফিরখানায় পরিণত হলো। সূফীবাদের নামে কিছু ভ্রান্ত আকীদা অনেকে পোষণ করত। কেউ কেউ মনে করত, সূফী উচ্চস্তরে পৌঁছলে তার আর শরীআতের বিধিনিষেধ পালন করার প্রয়োজন নেই। এজন্য স্থানীয় হাম্বলীগণ সূফীদের মারাত্মক বিরোধী ছিলেন। এরা মূলধারার সূফীদের প্রতিনিধিত্ব করতো না; এদের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু সূফীদের সমালোচনার পেছনে এদের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। এমন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে শাইখ জিলানী (র.) বক্তৃতা, লেখনি ও শিক্ষায় শরীআতের সাথে আধ্যাত্মিকতার এক গভীর মেলবন্ধন তুলে ধরলেন। তিনি সরাসরি বললেন, তুমি হাকীকতের অবস্থায় থাকলে- যা প্রকৃতপক্ষে ওয়ালায়াতের অবস্থা; তোমার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করো এবং সমস্ত আদেশ পালন করো...। (*ফুতুহুল গাইব*)

যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের কাছে তিনি যা কিছু শিখেছিলেন, সবই এবার মানবকল্যাণে উৎসর্গ করলেন। শষ্যক্ষেত্রের সেই ষাঁড়ের কথা এবার সত্য হলো। তিনি শরীআত-তরীকত উভয়দিক থেকে সমানভাবে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন- এমন সমস্ত শাস্ত্রই তিনি শেখাতেন। ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী লিখেছেন,

'শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ পাঠদানে গভীর নিষ্ঠাবান ছিলেন। আলিম হিসেবেও অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন। মোট তেরোটি শাস্ত্র নিয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে তাফসীর, হাদীস, বিভিন্ন মাযহাব, ইখতিলাফ ইত্যাদি নিয়ে পড়তো। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাফসীর, বিভিন্ন মাযহাবের জ্ঞান, ইখতিলাফ, ধর্মতত্ত্ব ও আরবী ব্যাকরণ এবং যোহরের পর বিভিন্ন পঠনরীতিতে কুরআন শিক্ষাদান করতেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুমাল্লাহ- উভয়ের মাযহাব অনুসারে তিনি ফাতওয়া দিতেন। তাঁর ফাতওয়াগুলো ইরাকের আলিমদের কাছে পাঠানো হতো। তাঁরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন।'

তাঁর অসাধারণ বক্তৃতামালা ফুতুহুল গাইব ও আল ফাতহুর রাব্বানীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম মনীষীর জীবনীগ্রন্থগুলোতে তাঁর অসংখ্য বাণী পাওয়া যায়।

তিনি সপ্তাহে মোট তিনদিন ভাষণ দিতেন। ঈদগাহে শুক্রবার সকালে, নিজের মাদরাসায় মঙ্গলবার রাতে এবং মুসাফিরখানায় বুধবার সকালে। তাঁর আলোচনা-সভা অন্যান্য সূফী শাইখের মতো ছিল না। কারণ তাঁর মজলিসে কেবল মুরীদেরা নয়, দেশ-বিদেশের সাধারণ মানুষও অংশ নিতেন। তাতে ফকীহগণ যেমন থাকতেন, তেমনি নিরক্ষর মানুষও থাকতেন। এমনকি অমুসলিমরাও অংশ নিত। শাইখ জিলানী (র.) এর হাতে অসংখ্য মানুষের তাওবার কথা ইমাম যাহাবী আল্লামা ইবনুল জাওযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ জিলানীর ওয়াযের মজলিসের প্রতি মানুষের এত আকর্ষণ ছিল যে, গভীর রাতে মোমবাতি নিয়েও অনেক মানুষ চলে আসতো। এমনকি জিনেরাও তাঁর মজলিসে অংশগ্রহণ করতো। মানুষের মতো বহু জিন তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিল, তাওবা করেছিল।

তাঁর আলোচনার তীব্র প্রভাবে কখনও কখনও শ্রোতাদের অনেকে ইন্তিকালও করতো। একবার আলোচনার মাঝখানে অজান্তেই তাঁর পাগড়ির এক কোণা খুলে গেল। এটা দেখে তাঁর অনুসরণে শ্রোতারাও নিজেদের অজান্তে পাগড়ি খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

শাইখ জুব্বায়ী বলেন, শাইখ আব্দুল কাদির

জিলানী (র.) বলেছেন, 'ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় আমাকে আদেশ দেওয়া হতো, নিষেধ করা হতো। মনের ভেতর অনেক কথা ভীড় করতো, প্রবল হয়ে উঠত। এমনকি শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হতো। আমি চুপ থাকতে পারতাম না। প্রথম দিকে আমার কাছে দুজন বা তিনজন মানুষ বসতো। ধীরে ধীরে লোকেরা আমার কথা জানতে পারলো। তখন লোকদের ভীড় বেড়ে গেল। এমনকি একেক মজলিসে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ উপস্থিত হতে লাগল।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার ইচ্ছা হতো, আমি আবারও মরুচারী হই; তখন আমিও কাউকে দেখতাম না, তারাও আমাকে দেখতো না। অবশ্য আল্লাহ চেয়েছিলেন, আমার মাধ্যমে মানুষের উপকার হোক। আমার হাতে পাঁচশোরও বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষ তাওবা করেছে। এটা একটা বিরাট কল্যাণ ছিল।'

মুহাম্মদ আইনী তাঁর 'আবদুল কাদির আল কিলানী' নামক বইয়ে লিখেছেন, 'বাগদাদে তাঁর মাদরাসা ও খানকা থেকে প্রতিবছর তিন হাজারের মতো ছাত্র ও মুরিদ ফারেগ হতেন। এ হিসেবে তেত্রিশ বছরের শিক্ষকতায় তাঁর কাছ থেকে আনুমানিক এক লক্ষ মুরিদ ও ছাত্র বেরিয়েছেন।' এরা শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেই পৃথিবীর নানান প্রান্তে দাওয়াতী কাজে ছড়িয়ে পড়তেন। এজন্য তাঁদের সবার নাম সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের মধে কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি:

১. মুওয়াফফিকুদ্দীন ইবন কুদামা। তিনি বিখ্যাত 'আল মুগনী' কিতাবের লেখক। তাঁকে তাঁর বাবা শাইখ জিলানী (র.) এর কাছে পড়তে পাঠান। তাঁর সাথে তাঁর খালাতো ভাই হাফিয আব্দুল গণী ইবন আব্দুল ওয়াহিদ আল মাকদিসীও ছিলেন। ইবন কুদামা বলেছেন, 'শাইখুল ইসলাম আব্দুল কাদিরের কাছ থেকে আমি ও হাফিয আব্দুল গণী একই সময় খিরকা গ্রহণ করেছি। তাঁর কাছে আমরা ফিকহ শিখেছি, হাদীস শুনেছি এবং তাঁর সুহবতে উপকৃত হয়েছি।'

২. আবুল ফাতাহ নাসর ইবনুল মুনা। ইনি শাইখ জিলানী (র.) এর ইন্তিকালের পর হাম্বলীদের ইমাম হয়েছিলেন।

৩. হামিদ ইবন মাহমুদ আল হাররানী। ইনি পরবর্তীতে নুরুদ্দীন জংগী (র.) এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। নুরুদ্দীন তাঁকে হাররানের গভর্নর বানিয়েছিলেন।

৪. যাইনুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন নাজা আল আনসারী আদ দিমাশকী। তিনি শাইখ জিলানী (র.) এর কাছে বাগদাদে শিক্ষাগ্রহণ করার পর দামেস্ক ও মিশর ভ্রমণ করেন। এক সময় তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (র.) এর খাস পরামর্শদাতায় পরিণত হন।

৫. ইমাম আবূ আমর উসমান। তিনি স্বীয় যুগের শাফিঈ নামে পরিচিত ছিলেন।

৬. মুহাদ্দিসে খুরাসান নামে প্রসিদ্ধ 'কিতাবুল আনসাব'র লেখক ইমাম হাফিয আব্দুল করিম ইবন মুহাম্মদ আস সামআনী।

দেখা যাচ্ছে, নুরুদ্দীন জংগী ও সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কয়েকজন বিশিষ্ট উপদেষ্টা ও সহচর সরাসরি শাইখ জিলানী (র.) এর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া তাঁর অসংখ্য ছাত্রদের অনেকেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব মাদরাসা গড়ে তোলেন। তাঁরা পার্থিব লালসা থেকে বিরত থেকে আত্মিক ও পরলৌকিক উন্নতির দিকে জোর দিতেন। এসব মাদরাসার ফারিগগণ পরবর্তীতে সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর উত্থান, সেনাবাহিনী গঠন ও বাইতুল আকসা মুক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ প্রসঙ্গে মাজিদ কিলানী 'হাকাযা যাহারা জিলু সালাহুদ্দীন ওয়া হাকাযা আদাত আল কুদস' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বড়পীর (র.) এর ভয়াবহ অর্থকষ্ট ও জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। আমরা এখন এর তাৎপর্য কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। এর মধ্যদিয়ে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'পৃথিবী বিভিন্ন রূপ ধরে এসে আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছে। প্রতিবার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। শয়তানও বিভিন্ন সুরতে আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে। প্রতিবার আল্লাহর সাহায্যে আমি রক্ষা পেয়েছি।' আসলে সোনাকে যেমন বারবার আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়, আল্লাহ যেন তাঁকে সেভাবেই নিষ্কলুষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। নফসে আম্মারা বিনাশে এসব বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। পার্থিব ধন-সম্পদ একসময় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি আগের জীবনধারাই বজায় রেখেছিলেন।

তাঁর দেহ সৌষ্ঠবের বর্ণনা দিতে গিয়ে শাইখ মুহাম্মদ আইনী বলেছেন, 'তিনি কিছুটা লম্বাটে ছিলেন। আভিজাত্য আর দৃঢ়তার ছাপ টিকরে বেরুতো। গায়ের রঙ ছিল হালকা তামাটে। প্রশস্ত মুখমণ্ডল, চওড়া কাঁধ আর সুবিন্যস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর ও সুউচ্চ- আলাপচারিতার ধরণও ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। তাঁর দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল ছিল যে, তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর দাড়ি ছিল লম্বা এবং মাঝারি ধরণের ঘন।'

ইবনুন নাজ্জার বলেছেন, আবূ মুহাম্মদ আল আখফাশকে আমি বলতে শুনেছি, আমি প্রায়ই তীব্র ঠাণ্ডা আর শীতের ভেতর শাইখ জিলানী (র.) এর কাছে এসে দেখতাম, তিনি কেবল একটি টুপি আর জামা পরা। এরপরও দরদর করে ঘামছেন। প্রচণ্ড গরমে যেমন করা হয়, সেভাবে লোকজন হাতপাখা নিয়ে তাঁর চারপাশে বাতাস করছে।'

তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের পরিপূর্ণ অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তাকওয়া, আমানতদারিতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা, মহানুভবতা ইত্যাদির দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর ভেতর। ইমাম শারানী তাঁর তাবাকাতে বলেছেন, 'এত বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়েও তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে সময় কাটাতেন, ফকীরদের সাথে বসে তাঁদের কাপড়ের উকুন বেছে দিতেন। [অন্যদিকে এত বিনয়ী হবার পরও] তিনি কোনো গণ্যমান্য ও রাষ্ট্রীয় পদস্থ মানুষের সম্মানে দাঁড়াতেন না, কোনো মন্ত্রী বা শাসকের দরজায় ধরনা দিতেন না।'

মুহাম্মদ ইবন খিদর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি ত্রিশ বছর শাইখের খিদমত করেছিলাম। এটকু সময়ে আমি কখনও তাঁকে থুথু ফেলতে অথবা নাক ঝাড়তে অথবা তাঁর শরীরে কোন মাছি বসতে দেখিনি। তিনি কখনও কারও সম্মানে দাঁড়াননি, রাজা-বাদশার সঙ্গে বসেননি, তাদের খাবারও খাননি। তিনি খলীফাকে চিঠি লিখলে এভাবে লিখতেন-

"আব্দুল কাদির তোমাকে এটা করতে আদেশ করছে। তাঁর আদেশ তোমাকে অবশ্যই মানতে হবে।"

খলীফা এই চিঠি পড়ে কেঁদে ফেলতেন। বলতেন, 'তিনি সত্য বলেছেন।'

শাইখ জিলানী (র.) বাগদাদে অবস্থানকালীন সময়ে মোট পাঁচ জন খলীফাকে পেয়েছিলেন। তিনি কারোরই বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করতেন না। এমনকি খলীফারা তাঁকে রাজদরবারে ডাকলেও যেতেন না। আবুল ফিদা বলেছেন, একবার খলীফা আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহ (৫৩০-৫৫৫ হি.) তাঁর উযীরকে বললেন বাগদাদের সমস্ত আলিমকে ডেকে পাঠাতে। সবাই আসার পর খলীফা উযিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই কি এসেছে?' উযীর বললেন, 'শাইখ আব্দুল কাদির আর আদি ইবন মুসাফির ছাড়া সবাই এসেছেন।' তখন ইরাকের মুফতী হিসেবে খ্যাত মুহিউদ্দীন আল বাগদাদী মন্তব্য করলেন, 'শাইখ আব্দুল কাদির অশ্লীলতা থেকে সবচেয়ে দূরের আর হকের দিকে সবচেয়ে কাছের মানুষ। আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘিত হলে তিনি সবচেয়ে কঠোর হয়ে পড়েন। তিনি নিজের জন্য রাগ করেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য প্রতিশোধ নেন না।'

আরেকদিন খলীফা উযীর জাফর ইয়াহইয়া ইবন হুবাইরার কাছে অভিযোগ করলেন, শাইখ জিলানী তাকে নিয়ে অবজ্ঞাভরে ঠাট্টা করেন। ঘটনা হলো, জিলানী (র.) এর খানকায় একটি খেজুর গাছ ছিল। তিনি প্রায়ই সেটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওহে খেজুর গাছ! বেশি বাড়

বেড়ো না। তোমার মাথা কিন্তু কেটে ফেলবো!' তিনি আসলে খলীফাকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন। তখন উযীর শাইখ আবুল হাসান ইবন আরাবিয়্যাকে শাইখ জিলানী (র.) এর কাছে পাঠালেন। অনুরোধ করলেন, তিনি যেন এভাবে খলীফার সমালোচনা না করেন।

ইবন আরাবিয়্যা বলেন, 'আমি গিয়ে দেখলাম, শাইখের চারপাশে অনেক মানুষ। ভাবলাম, সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তখন শাইখ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ। আমি তার মাথাটা কেটেই ফেলবো!' বুঝতে পারলাম, কথাটা আসলে আমার উদ্দেশ্যেই বলা। তাই চুপচাপ উঠে চলে আসলাম। উযীর পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'শাইখকে বলেছো?' আমি তখন এ ঘটনার কথা বললাম। উযীর তখন কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'তিনিই যে সঠিক পথে আছেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।' খলীফাগণ নিজেরাই তাঁর দরবারে আসতেন। তাঁদের উপহার উপঢৌকন তিনি গ্রহণ করতেন না। একবার খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহ (মৃ. ১১৭১ খ্রি.) তাঁর কাছে এসে দশ ব্যাগ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন। সেগুলো এতই ভারী ছিল যে, দশ জন লোককে বয়ে আনতে হলো। শাইখ বরাবরের মতোই গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। খলীফা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শাইখ জিলানী তখন দুহাতে দুটি ব্যাগ নিয়ে চাপ দিলেন। দীনারগুলো থেকে ঝরঝর করে তাজা রক্ত পড়তে লাগলো। শাইখ তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর কাছে কি এতটুকু লজ্জা করো না? মানুষের রক্ত নিজে খাও, আবার আমার কাছেও হাদিয়ার জন্য নিয়ে আসো!' খলীফা এ ঘটনা দেখে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

খলীফা মুসতানজিদ আরেকদিন এসে বললেন, আমাকে একটি কারামত দেখান। শাইখ জিলানী (র.) বললেন, 'এই মুহূর্তে তুমি কী চাও?' খলীফা আপেলের কথা বললেন। তখন শাইখ বাতাসে হাত বাড়িয়ে দুটি আপেল আনলেন। একটি আপেল দিলেন খলীফাকে। শাইখের হাতের আপেল থেকে মিশকের ঘ্রাণ বের হলেও খলীফার আপেলের ভেতরে পাওয়া গেল একটি পোকা। তিনি বললেন, 'এটা কেন?' শাইখ তখনই জবাব দিলেন, 'আপেলটি পোকা-ধরা; কারণ একজন অত্যাচারীর হাত সেটাকে স্পর্শ করেছে।'

সিয়ারু আলামীন নুবালায় ইমাম যাহাবী তাঁর বেশ কিছু কারামত সনদসহ উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ওলীগণের কারামতের ক্ষেত্রে সনদ পাওয়া যায় না। এদিক থেকে শাইখ জিলানী (র.) এর কারামতগুলো ব্যতিক্রম।

ইমাম যাহাবী লিখেছেন, হাফিয সাইফুদ্দীন ইবনুল মাজদের হস্তাক্ষরে লেখা দেখেছি, আমি মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ আল মারাতিবীকে বলতে শুনেছি, শাইখ আবূ বকর আল ইমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে খটকা তৈরী হলো। ভাবলাম শাইখ আবদুল কাদিরের মজলিসে যাই। শুনেছিলাম তিনি মনের ওয়াসওয়াসা নিয়ে আলোচনা করেন। আমি তাঁর দরবারে গেলাম। তিনি আলোচনা করছিলেন। তিনি তখন বলে উঠলেন, 'আমাদের আকীদা হলো সালফে সালিহীন ও সাহাবীগণের আকীদা।' ভাবলাম, তিনি বোধহয় কথাটা কাকতালীয়ভাবে বলেছেন। তিনি এবার সরাসরি আমি যেদিকে বসেছি, সেদিকে তাকিয়ে একই কথা বললেন। মনে মনে বললাম, একজন আলোচক তো চারিদিকে তাকাবেনই। এবার তিনি সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে নাম ধরে বললেন, 'ওহে আবূ বকর! আমাদের আকীদা হল সালফে সালিহীন ও সাহাবীগণের আকীদা।' এরপর বললেন, 'তোমার বাবা চলে এসেছেন।' আমার বাবা তখন শহরে ছিলেন না। আমি দ্রুত বাসায় আসলাম। এসে দেখি তিনি আসলেই এসেছেন।'

ইমাম যাহাবী বলেন, আমাকে বলেছেন, ফকীহ আবুল কাসিম ইবন মুহাম্মদ, তিনি শাইখ জামালুদ্দীন ইয়াহইয়া আস সাইরাফী থেকে বর্ণনা করেন, আবুল বাকা আন নাহওয়ী বলেন, 'আমি একদিন শাইখ আবদুল কাদিরের মজলিসে আসলাম। উপস্থিত লোকেরা তাঁর সামনে অশুদ্ধ তিলাওয়াত করছিলো। মনে মনে বললাম, 'শাইখ এটা নিয়ে আপত্তি না করে থাকছেন কীভাবে?'

তখন তিনি বলে উঠলেন, 'ফিকহ নিয়ে পড়াশোনা করা একজন লোক এসেছে। সে অপছন্দ করছে।' মনে মনে বললাম, 'তিনি সম্ভবত অন্য কারও কথা বলছেন।' তিনি আবার বললেন, 'আমি তোমার কথাই বলছি।' আমি মনে মনে এমন নেতিবাচক ভাবনার জন্য তওবা করলাম। তিনি এবার বললেন, 'আল্লাহ তোমার তাওবা কবূল করেছেন।'

ইমাম যাহাবী বলেন, আমাকে বলেছেন ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়া, তিনি শাইখ ইযযুদ্দীন আল ফারুসী থেকে বর্ণনা করেন, শাইখ শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দী বলেন, 'আমি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবো বলে ভাবছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, শাইখ আবদুল কাদিরের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করবো। তাঁর কাছে আসার পর কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'উমর! সেটা তো কবরের পাথেয় নয়। উমর! সেটা তো কবরের পাথেয় নয়।'

তাঁর কারামত এত বেশি প্রকাশিত হতো যে, শাহযাদা দারা শুকোহ'র মতে, 'কারামতগুলো এক করলে বিশাল একটি গ্রন্থেও সবগুলোর জায়গা হবে না।' এরপরও আল্লাহর প্রতি তাঁর বিনম্রতা ও আনুগত্য এতটুকু হ্রাস পায়নি, বরং প্রতিটি মুহূর্তে তা বেড়েই চলেছিল। এটাকেই যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কারামত ধরা হয়, তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। শাইখ সাদী তাঁর গুলিস্তাঁয় লিখেছেন, 'একবার শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)কে দেখা গেল কাবা চত্বরে সিজদায় পড়ে বলছেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যদি শাস্তি অবধারিত করেই ফেলেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ বানিয়ে উঠাবেন- নেককারদের চেহারা দেখে আমাকে যাতে লজ্জায় মিশে যেতে না হয়।

তাকওয়া, ধৈর্য, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি ছাড়াও অসাধারণ মানবতাবোধ ছিল তাঁর আজন্ম লালিত গুণ। মহানুভবতা ও অপরকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি বলতেন, 'আমি সবধরণের নেককাজ যাচাই করেছি। কিন্তু অপরকে খাওয়ানোর মতো উত্তম আর কিছুই পাইনি। আমি আশা করি, পুরো দুনিয়াটা যদি আমার হাতে থাকতো আর আমি সবাইকে আপ্যায়ন করতাম!'

তিনি আরও বলেছেন, যদি আমার কাছে কোনোদিন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাও আসে, আমি সেটা রাত পর্যন্ত জমিয়ে রাখবো না।'

শরীআত ও তরীকতের এই মহান সাধক ১১ রবিউস সানী ৫৬১ হি:/২১ ফেব্রুয়ারি ১১৬৬ খ্রি. মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে বিকেলে একানব্বই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। উপমহাদেশে এই দিন গিয়ারভী শরীফ নামে পরিচিত। এদিনে তাঁর রূহের প্রতি ইসালে সাওয়াবের মাহফিলকে ফাতিহা ই ইয়াজদাহম বলা হয়। অবশ্য আল্লামা ইবনুল জাওযী *আল মুনতাযাম* গ্রন্থে বলেন, 'শাইখ আব্দুল কাদির আল কিলানী (র.) ৮ রবিউস সানী, ৫৬১ হি. শনিবারের রাতে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর নব্বই বছর বয়স।' তাঁর ছেলে শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এরপর তাঁর মাদরাসা প্রাঙ্গণে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)কে আল্লাহ যে গভীর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও সুবিশাল মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁর প্রভাব আজও বিদ্যমান। তাঁর জীবনচরিত পড়ে, তাঁর আলোচনার বর্ণনা ও কিতাবগুলো পড়ে, তাঁর উপদেশ অনুসারে আমল করে, তাঁর তরীকাবন্দি, তাঁর ফায়িয-তাওয়াজ্জুহ লাভ করে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজও হিদায়াত পাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ফায়িয ও তাওয়াজ্জুহ দান করুন। আমীন।

সিনওয়ারের সিংহাসন

মুহাম্মাদ বিন নূর

আল আকসার তুফান তখনো শুরু হয়নি। ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী হন্য হয়ে খুঁজছিল তাঁকে। ২০২১ সালের যুদ্ধে তাঁকে না পেয়ে গুড়িয়ে ফেলে তার বাড়ি। যুদ্ধ শেষে সেই বাড়ির ধ্বংসস্তুপের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আরাম কেদারায় বসা অবস্থায় তাঁর যে ছবিটি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর শাহাদতের সময়কার ছবি দেখে বারবার সেই ছবিটির কথা মনে পড়ছে। আরেক বার তো তিনি ঘোষণা দিয়ে সংবাদ সম্মেলন শেষে গাযার রাজপথ ধরে বাড়ি ফিরেছিলেন, দখলদার বাহিনী সেবারও তার কিছুই করতে পারেনি। এবার, আল আকসার তুফান শুরু হওয়ার পরও তার বাড়ি গুড়িয়ে ফেলে দখলদার বাহিনী সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষে তল্লাশি চালিয়ে তার জুতা উদ্ধার করতে পেরেছিল, এবং সেটি ছিল সেই দিনের ইসরায়েলী গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় খবর! বলছি ইয়াহইয়া সিনওয়ারের কথা। দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা যার জুতা আবিষ্কার করে উল্লাসিত হয়, যাঁর নাগাল পেতে টানা এক বছরেও সাফল্যের দেখা পায়নি দখলদার বাহিনী, সবশেষে তার বীরোচিত শাহাদত হলো বটে, কিন্তু সেই অভিযানে অংশগ্রহণকারীরাও শাহাদতের পূর্বাবধি তাঁর পরিচয় পায়নি।

ইয়াহইয়া সিনওয়ার হামাসের অন্যতম রহস্যপুরুষ ছিলেন বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। শীর্ষ হামাস নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন ইসরায়েলের কারাগারে থেকেছেন, ইউরোপ থেকে আগত বহু ইসরায়েলী দখলদারদের চেয়ে ভালো হিব্রু বলতে পারতেন, গাযায় হামাসের প্রধান হিসেবে গত বছর ৭ই অক্টোবরের তুফানের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে তার নামই বিশ্বমিডিয়ায় বহুল আলোচিত, সবশেষ অতি সম্প্রতি ইরানে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়্যার শাহাদাতের পর হামাস সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে হামাসের প্রধান নিযুক্ত করে।



হামাস প্রধান হিসেবে তাকে একই সাথে যেমন গাযার বেসামরিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে হচ্ছিল, সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছিল, আবার হামাসের কূটনৈতিক কার্যক্রমের দিকেও তাকেই নজর রাখতে হচ্ছিল। দখলদার বাহিনী প্রায় নিশ্চিত ছিল, তিনি হয়তো গাযার ভূগর্ভস্থ কোন এক নিরাপদ সুড়ঙ্গে বসে ঠান্ডা মাথায় যুদ্ধ ও কুটনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, যে কোন সাধারণ মানুষের মাথায় এমন চিন্তাই আসবে, কিন্তু হামাসের রহস্যমানব সিনওয়ার যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া এক বীরযোদ্ধা! গাযায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ চলছে রাফা অঞ্চলে, এই অঞ্চলের তেল সুলতান এলাকা সবচেয়ে বিপজ্জনক, আর সিনওয়ারের শাহাদত হয়েছে সেই তেল সুলতানের এক পরিত্যক্ত বাড়িতে।

ইসরায়েলীদের অপপ্রচার ছিল তিনি কোন সুড়ঙ্গে লুকিয়ে আছেন, নয়তো ইসরায়েলের যে সকল নাগরিক হামাসের হাতে বন্দী তাদেরকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করছেন কিংবা নারী-শিশুদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন তাই তাঁর উপর আক্রমণ করতে পারছে না। অথচ দেখা গেলো, তাদের সব অপপ্রচার ভুল প্রমাণিত করে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের ময়দানে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে বীরের মতো পরম আকাঙ্খার শাহাদাতকে আক্ষরিক অর্থেই "বরণ" করে নিলেন।

প্রতিরোধযুদ্ধের এই প্রবাদপুরুষের জীবনের শেষ মুহূর্ত আরবদের নিকট সত্যিকারের প্রবাদে পরিণত হলো, শেষ মুহূর্তে আহত অবস্থায় যে লাঠি দখলদারদের ড্রোনের দিকে ছুঁড়েছিলেন, আরবী ভাষায় সেই লাঠিও প্রবাদের অংশ হয়ে পড়লো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন "প্রাণপণে লড়া" অর্থে "সিনওয়ারের লাঠি ছোঁড়া" কথাটি প্রবাদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এক আহত সিংহের মুখোমুখি হতে বিশাল বাহিনীর আর উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে দখলদার বাহিনী পরিণত হয়েছে হাস্যরসের খোরাকে।

সিনওয়ারের শাহাদাতের পর এমনকি তার সমালোচকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, তিনি সত্যিকারের মহাবীরের মতো মহাকাব্যিক মৃত্যুবরণ করেছেন, কাপুরুষের মতো সাইরেনের আওয়াজে মাটির নিচে পালিয়ে যাননি, যেমনটা তার প্রতিপক্ষ দখলদার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গ প্রতিদিন করছেন। দখলদার বাহিনী হয়তো তাঁর শাহাদাত নিয়ে মিথ্যা গালগল্প ছড়াতো, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সে সুযোগ দেননি। শাহাদাতের পরও তাঁকে চিনতে না পেরে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার আগেই সেই অভিযানের ভিডিও অভিযানে অংশগ্রহণকারী দখলদার সেনারা প্রকাশ করে ফেলায় তার শৌর্যবীর্যের বিষয়ে কোন ধরনের অপপ্রচারের সুযোগ হয়নি দখলদারদের। বরং শাহাদাতের পরও তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন, সারা দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট তিনি হয়ে উঠেন মহানায়ক।

তাঁর শাহাদাতের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে এলে শুধু আরব বা মুসলিমগণই নয়, পশ্চিমাদের অনেকেই শ্রদ্ধাভরে তাঁকে নিয়ে কথা বলেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য তাঁর এই আত্মোৎসর্গের চিত্র সবার হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে । মুসলিম বিশ্বে তিনি রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন, অথচ এই পরিস্থিতিতেও

আপাদমস্তক ইসরায়েলের দালালিতে ব্যস্ত মুসলিম নামধারীদের আচরণ ঠিক বিপরীত। দুনিয়াজুড়ে সালাফী ঘরানার বেশির ভাগ শাইখ নামধারী লোকেরা সিনওয়ার আর তাঁর লড়াইকে নিয়ে নানা অসংবেদনশীল মন্তব্য করছে, কেউ সরাসরি তাঁর সমালোচনা করছে, কেউবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছে।

পুরো আরববিশ্ব যখন তাঁর শাহাদাতে শোকাহত, সৌদি মালিকানাধীন আল-আরাবিয়া আর এমবিসি চ্যানেল সিনওয়ারকে নিয়ে যাচ্ছে তা প্রচার করছে। এমবিসির এক উপস্থাপক সরাসরি সিনওয়ারকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে, শেষ পর্যন্ত গণরোষের মুখে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ তাকে সরাতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সকল সৌদি সংবাদমাধ্যমের গত এক বছরের সংবাদ বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায়, এটাই মূলত তাদের অফিসিয়াল অবস্থান, হয়তো বা গণরোষের মুখে কিছুটা পিছু হটেছে। সৌদি শাসকগোষ্ঠী থেকে শুরু করে গণমাধ্যম, সকলেই যেন তাদের এক মহাশত্রুর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, পুরো মুসলিম উম্মাহর বিপরীতে তাদের এই অবস্থান মুসলিম বিশ্বের জায়োনিস্ট হিসেবে তাদের কুখ্যাতি আবারো সকলের সামনে স্পষ্ট করে তুলছে। জায়োনিস্ট ছাড়া আর কে ইয়াহইয়া সিনওয়ারের শাহাদাতে আনন্দিত হতে পারে!

সিনওয়ারের শাহাদাতের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি শুনে মনে হচ্ছিল, কেবল সিনওয়ারের কারণেই যুদ্ধবিরতি হচ্ছে না, এখনই বহুল প্রতীক্ষিত যুদ্ধবিরতিটা হয়ে যাবে, যদিও নেতানিয়াহুর বক্তব্যে ঠিক বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে, এবং বাস্তবে কিছু হওয়ার কোন লক্ষণ অন্তত এখন অবধি দেখা যাচ্ছে না। হামাসের দিক থেকে সিনওয়ারের শাহাদাতের ঘোষণার সাথে সাথেই জানানো হয়েছিল, হামাস সিনওয়ারের রেখে যাওয়া পথেই থাকবে, তাঁর নীতিতে কোন ধরনের রদবদল আসবে না, এখন অবধি হামাসের কার্যক্রম থেকে তাদের এই ঘোষণার বাস্তবতা প্রমাণিত হচ্ছে।

ইসলামের ইতিহাস বলে, মুসলিম উম্মাহ কখনো কোন এক ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপ্রধানের শাহাদতের পরও মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে, শেখ ইয়াসিন-রানতিসীদের শাহাদাতের পরও হামাস তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে, একইভাবে হানিয়্যা-সিনওয়ারের শাহাদাতের পরও প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, আল্লাহর সাহায্যে চূড়ান্ত বিজয় আসবেই। সিনওয়ারের শাহাদাতের পর গাযার প্রতিরোধ যুদ্ধে তাই কোন পরিবর্তন আসেনি। তবে সিনওয়ার এই প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক হিসেবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, আর ইসরায়েল নামক দখলদার রাষ্ট্রও যতদিন টিকে থাকবে, সিনওয়ারের নাম তাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকবে।

দখলদার বাহিনী সিনওয়ারের শেষ মুহূর্তের যে ভিডিওচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে আহত সিনওয়ারকে একটি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ফিলিস্তিনী কবি তামীম আল বারগুসী সে দৃশ্য দেখে সিনওয়ারের শোকগাথার এক পর্যায়ে লিখেছেন-

"যেন খলীফার মতো বসে আছেন সিংহাসনে

অনুসারীরা তার বাইআত নিচ্ছে—আসমান ও যমীনে।"

সত্যিই তো, এতো এতো মুসলিম রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু হাদীসে রাসূলের বর্ণনা মতে বাইতুল মাকদিসের আশেপাশে কিংবা আসকালানের মুজাহিদ-মুরাবিতদের কায়িদ তো এই আহত ইয়াহইয়া সিনওয়ারই, দখলদার ইসরায়েলের সহযোগী আরব-মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে সিনওয়ারের এই সিংসাহসনের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ কোথায়? সিনওয়ারের এই ভাঙা সিংহাসনই তাই মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে আবেগাপ্লুত করে, বিশাল বিশাল লকবধারী মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কারোরই স্থান হয় না সেই আবেগাপ্লুত মানুষের হৃদয়ে। বারগুসী তার এই কবিতায় সিনওয়ারের লাঠিকে প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতি সিনওয়ারের শেষ ওসীয়ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, প্রতিরোধযোদ্ধারা সেই ওসীয়ত পালনও করছেন, অচিরেই নদী থেকে সমুদ্র অবধি স্বাধীন ফিলিস্তীন কায়েমের মধ্য দিয়ে সে ওসীয়ত পূর্ণতা পাবে।

মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ

ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাক্বী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।

সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)

বাসা-২৩, ব্লক-ডি, রোড-১৪, শাহ্‌জালাল উপশহর, সিলেট

এই মাসে এই চাঁদে

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর ইন্তিকাল

আমরা এমন কোনো রমণী দেখিনি যে তাঁর জাতির জন্য জুওয়াইরিয়া (রা.) অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। কেননা তাঁর দ্বারা বনী মুস্তালিকের হাজার হাজার পরিবার মুক্তি লাভ করেছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) যাঁর প্রশংসায় এই উক্তি করেন, তিনিও ছিলেন একজন উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)। তাঁর পিতার নাম হারিস ইবন আবী যারার, খুযাঈ মুস্তালিক বংশের নেতা। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) উম্মুল মুমিনীন হওয়ার পূর্বে মুসাফি ইবন সাফওয়ানের স্ত্রী ছিলেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার এবং উম্মুল মুমিনীন হওয়ার এক চমৎকার কাহিনী আছে। হিজরী ৫ সালে কাফিরদের সঙ্গে মুসলমানদের মুস্তালিক বা মুরাইসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বহু দাস-দাসী মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর স্বামী সাফওয়ান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং জুওয়াইরিয়া (রা.) মুসলমানদের হাতে বন্দী হন এবং তিনি হযরত কাইস ইবন শামমাস আনসারী (রা.)- এর ভাগে পড়েন। কিন্তু হযরত কাইস ইবন শামমাস ৯ "উকিয়া" সোনার বিনিময়ে তাঁর সাথে মুক্তিপণ চুক্তি করেন (এক উকিয়ার পরিমাণ ২৮ গ্রাম)। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হারিসের কন্যা, আমার অবস্থা আপনার কাছে গোপন নয়। আমি কাইস ইবন শামমাস (তাঁর বর্ণনায় সাবিত ইবন কাইস ইবন শামমাস)-এর ভাগে পড়েছি। আমি তার সাথে ৯ উকিয়া সোনা প্রদানের বিনিময়ে মুক্তিপণ চুক্তি করেছি। কিন্তু এই পরিমাণ সোনা প্রদান করা আমার সাধ্যের বাইরে, আমি আপনার বদান্যতার আশায় শর্তটি কবূল করেছি এবং এখন আমি এ ব্যাপারে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এর অপেক্ষা উত্তম বস্তু আশা করো না? জুওয়াইরিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? হুযুর ﷺ বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণের সোনা পরিশোধ করে দেব এবং তোমাকে আমার আকদে আনতে চাই, তোমার সম্মতি আবশ্যক। এতে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর হুযুর ﷺ সাবিত ইবন কাইস (রা.)-কে ডেকে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে সাবিত (রা.) তাতে রাযি হয়ে যান এবং হুযুর ﷺ তাঁকে ৯ উকিয়া আদায় করে দেন। হুযুর ﷺ জুওয়াইরিয়া (রা.)-কে আযাদ করে দেন। অতঃপর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেন। এভাবে হযরত জুওয়াইরিয়া উম্মাহাতুল মুমিনীনের অন্তর্ভুক্ত হন। হুযুর ﷺ-এর সঙ্গে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর বিয়ের এ খবর বনী মুস্তালিকের মধ্যে পৌঁছার পর তারা হুযুর ﷺ-এর সম্মানার্থে তাদের সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আয়িশা (রা.) যে উক্তি করেন, শুরুতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর বিশ বছর বয়সের সময় হুযুর ﷺ-এর সাথে বিয়ে হয়। তাঁর পূর্ব নাম ছিল বাররা। হুযুর ﷺ তা পরিবর্তন করতঃ জুওয়াইরিয়া নাম রাখেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাতটি বলে জানা যায়; দুইটি বুখারীতে, দুইটি মুসলিম এবং বাকীগুলো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৬/৬৭৫ সালে (মতান্তরে হিজরী ৫০ সালে) ২৮ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন এবং মদীনায় জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

পারস্য সম্রাটের শোচনীয় মৃত্যু

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির নবী ও সকলের রাসূল এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবীরূপে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বলে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে। তাই মহানবীর নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব কোনো জাতি, গোত্র বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র বিশ্বের মানবমণ্ডলীর কাছে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মহান লক্ষ্যে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিশ্বের খ্যাতনামা রাজন্যবর্গের নামে তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে কয়েকখানা পত্র প্রেরণ করেন এবং পত্রে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাসানী বংশীয় পারস্য সম্রাটের নামেও একখানা পত্র প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল 'কিসরা'। তখন সম্রাট ছিলেন খসরু পারভেজ ইবন হরমুয ইবন নওশেরওয়া। নওশেরওয়া ন্যায় ও সুবিচারের জন্য 'আদিল' নামে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন। নওশেরওয়া-এর পৌত্র খসরু পারভেজের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রের মর্ম ছিল এইরূপ-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান কিসরা সমীপে। যে সৎপথ অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হয়, তার উপর সালাম (শান্তি)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং সমগ্র জীবিত মানবসমাজকে সতর্ক করার জন্য আমি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তি পাবেন । অন্যথায় আপনি জড়োপাসনাজণিত পাপের জন্য দায়ী হবেন।

পারসিক জাতির ধর্মগুরু ছিল জরদস্ত এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিলো জেন্দাবেস্ত ও অগ্নিপূজা ছিল তাদের ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রে জড়োপসনাজণিত পাপ বলেছেন। যা হোক, পত্রবাহক হযরত আবদুল্লাহ সাহমী (রা.) পত্রখানা বাহরাইনের শাসনকর্তাকে হস্তান্তর করেন এবং তিনি তা কিসরা (খসরু পারভেজ)-কে প্রদান করেন। অত্যন্ত উগ্র ও আত্মাভিমানী খসরু পত্রের প্রথমাংশ শ্রবণ করেই ক্রোধান্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিপিখানা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দূতকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর শ্রবণ করে বললেন, আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে অচিরেই এইরূপ ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র লিপি ও তাঁর দূতের সাথে গোস্তাখী করার পরও পারস্যরাজা ক্ষান্ত হলেন না। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তা বামান এর প্রতি পরওয়ানা প্রেরণ করলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে গ্রেফতার করে তার দরবারে প্রেরণ করা হোক। বামান দুজন সুবিজ্ঞ দূত বাবুইয়া ও খারখারাকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। তারা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, পারস্য সম্রাট আপনাকে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আপনি তাঁর এই আদেশ অমান্য করলে তিনি আপনার ও আপনার দেশের ধ্বংস সাধন করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, আপনারা অদ্য বিশ্রাম করুন। আগামী দিন যথোচিত জবাব পাবেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে অবহিত হলেন যে ঐ রাতেই খসরু তার পুত্র শেরওয়ার হাতে নিহত হয়েছে। ভোরে তিনি একথা ঘোষণা করেন এবং দূতদ্বয়কে অতি সমাদরে বিদায় করেন। তারা প্রত্যাবর্তন করার পর ঘটনার সত্যতা জানতে পারেন। এটি হিজরী সপ্তম সালের ১০ জমাদিউল আউয়ালের ঘটনা।

উল্লেখ্য, খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে ইয়ারমুক যুদ্ধে পারস্যের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বদদুআর পরিণতি; তাঁর আরেকটি জীবন্ত মুজিযা-আলৌকিক ঘটনা।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

প্রশ্ন-০১: জামাআতের সাথে নামায আদায়কালে মুকতাদী ইমামের পিছনে সূরা বা কিরাত পড়তে পারবে কী? মুকতাদী যদি নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্য ইমামের সাথে সূরা বা কিরাত পাঠ করেন তাহলে সেটা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়িয হবে কি?

জবাব: জামাআতে নামায আদায়কালে মুকতাদীর জন্যে ইমামের সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য সূরা উচ্চস্বরে পাঠের সময় নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা এবং নিম্নস্বরে পাঠের সময় চুপ থাকা সুন্নাত। মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-যখন (নামাযে) কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো। নিশ্চয় এতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। (সূরা আরাফ, আয়াত-২০৪)

উক্ত আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট বিষয়ে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের অভিমত অনুযায়ী আয়াতখানা নামাযে মুকতাদীগণ চুপ থেকে মনযোগ সহকারে ইমামের কিরাত শ্রবণ করার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে তাফসীরে তাবারী গ্রন্থে লিখেছেন,

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المكتوبة وقرأ أصحابه خلفه، فنزلت هذه الآية

(তাফসীরে তাবারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৪; তাফসীরে নাসাফী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২)

তাফসীর আদ দুররুল মানসূর গ্রন্থে এ সম্পর্কে এসেছে-

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه عَن عبد الله بن مُغفل أَنه سُئِلَ أَكُلُّ من سمع الْقُرْآن يُقْرَأُ وَجب عَلَيْهِ الِاسْتِمَاع والإنصات قَالَ: لَا قَالَ: إِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} فِي قِرَاءَة الإِمام إِذا قَرَأَ الإِمام فاستمع لَهُ وأنصت

(আদ দুররুল মানসূর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৫)

ইমামের পিছনে জামাআতে নামায আদায়ে মুকতাদী সূরা ফাতিহা বা কিরাতের কিছুই না পড়ে চুপ থাকবে। কেননা এমতাবস্থায় ইমামের কিরাত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ, সুনান আন নাসাঈ ও সুনান ইবন মাজাহ সহ বহু হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম বানানো হয় তাকে যথাযথ অনুকরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন তিনি কিরাত পড়েন তখন তোমরা চুপ থাকো। (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯১; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৬০৪; সুনান আন নাসাঈ, হাদীস-৯৯৫; মুসনাদ আহমদ, হাদীস-৮৮৮৮; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৮৮৯৮)

সুনান ইবন মাজাহ কিতাবে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নামাযে যার কোনো ইমাম আছেন, ইমামের কিরাত পাঠই তার কিরাত পাঠের স্থলাভিষিক্ত। (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৫০)

আল মুজামুল আওসাত কিতাবে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নামাযে যার কোন ইমাম আছেন, ইমামের কিরাত পাঠই তার কিরাত পাঠের স্থলাভিষিক্ত। (আল মুজামুল আওসাত, হাদীস-৭৫৭৯)

হাদীসের প্রাচীনতম কিতাব মুআত্তা মালিকের বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যিনি ইমামের পিছনে নামায আদায় করেছেন, ইমামের কিরাত পাঠই তার কিরাত পাঠের স্থলাভিষিক্ত। (মুআত্তা মালিক, হাদীস-১১৫)

তাছাড়া সুনান বাইহাকী, সুনানুদ্দারু কুতনী সহ হাদীসের অনেক কিতাবে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যারা ইমামের পিছনে মুকতাদীকে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক বলে মনে করেন এবং সে হাদীসে মুক্তাদীদের ভিন্ন হুকুম নেই বলে মনে করেন তাদের জবাবে আবূ দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বযলুল মাজহুদ কিতাবে লিখেছেন,

والدلائل على تخصيصه كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ومنها: ما رواه مسلم وغيره: "وإذا قرأ فأنصتوا"، ومنها: ما قال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلَّا وراء الإمام وهذا الحديث وإن كان موقوفًا لكنه في حكم المرفوع، ومنها: حديث جابر المرفوع: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وإسناده صحيح

-সুরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে কেবল ইমাম ও একাকী নামাযীর জন্য প্রযোজ্য হওয়ার বহু দলীল বিদ্যমান। তন্মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর বাণী- যখন (নামাযে) কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। আরো রয়েছে ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যের বর্ণনা- ইমাম যখন কিরাত পড়েন তোমরা তখন চুপ থাক। আরেক দলীল হচ্ছে- হযরত জাবির (রা.) এর বর্ণনা- যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতিত নামাযের কোন রাকাআত পড়ল, তার নামায হয়নি, তবে যে ইমামের পিছনে নামায পড়ল তার বিষয় ভিন্ন। হাদীসখানা মাওকুফ হলেও বিধানের দিক থেকে মারফু এর অন্তর্ভুক্ত। আর অন্য হাদীস হচ্ছে- হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত মারফু হাদীস "যিনি ইমামের পিছনে নামায আদায় করেন, ইমামের কিরাত পাঠই তার কিরাত পাঠের স্থলাভিষিক্ত।" উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। (বাযলুল মাজহুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫)

তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা ও কিরাত না পড়াকে সুন্নাত বলে রায় দিয়েছেন। তাই ইমামের পিছনে মুকতাদী জামাআতে নামায আদায়কালে সূরা ফাতিহা কিংবা কিরাত পড়া সুন্নাতের পরিপন্থি হিসেবে হানাফী মাযহাব মতে মাকরূহ হবে; একাগ্রতার জন্য কিংবা অন্য যেকোন উদ্দেশ্যেই তা পড়ুক না কেন।

প্রশ্ন-০২: চাদর বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে নামায পড়ার বিধান কী? মাস্ক পরিধান করে কি নামায পড়া যাবে?

জবাব: বিনা ওজরে চাদর বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য বিশেষ ওজরে কিংবা কোন সমস্যার কারণে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না; যেমন- বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ নয়।

বাদাইয়ুস সানাঈ কিতাবে লিখেছেন-

وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّغْطِيَةِ مَنْعًا مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ غَطَّى بِيَدِهِ فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ الْيَدِ، وَقَدْ قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ» وَلَوْ غَطَّاهُ بِثَوْبٍ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَجُوسِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَلَثَّمُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ النَّارَ وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «نَهَى عَنْ التَّلَثُّمِ فِي الصَّلَاةِ» إلَّا إذَا كَانَتْ التَّغْطِيَةُ لِدَفْعِ التَّثَاؤُبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا مَرَّ.

(বাদাইয়ুস সানাঈ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৬)

দুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر، كتعرض لقملة قبل الاذى، وترك كل سنة ومستحب،

(দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা-৮৯)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(قَوْلُهُ وَالتَّلَثُّمُ) وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ حَالَ عِبَادَتِهِمْ النِّيرَانَ زَيْلَعِيٌّ. وَنَقَلَ عَنْ أَبِي السُّعُودِ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ

(রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫২)

এসম্পর্কে নূরুল ইযাহ কিতাবে লিখেছেন-

يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ...وتغطية أنفه وفمه

নামাযীর জন্য ৭৭ টি কাজ করা মাকরূহ। ... (তন্মধ্যে রয়েছে) নাক ও মুখ ঢেকে নামায পড়া। (নূরুল ইযাহ, পৃষ্ঠা ৭১-৭৩)

এ সম্পর্কে মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখেছেন-

وتغطية أنفه وفمه لما روينا

আর নামাযে নাক ও মুখ আবৃত করা মাকরূহ, সে কারণে যা আমরা (পূর্বে) বর্ণনা করেছি। (মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা-১৩০)

হাশিয়াতুত তাহতাবী কিতাবে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

لما روينا من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغطي الرجل فاه كذا في الشرح

নাক ও মুখ ঢাকা মাকরূহ হওয়ার কারণ হিসেবে আমরা যা (পূর্বে) বর্ণনা করেছি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন পুরুষ ব্যক্তিকে নামাযে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন। (হাশিয়াতুত তাহতাবী, পৃষ্ঠা-৩৫৫)

সহীহ ইবন হিব্বান, মুস্তাদরাক হাকিম ও সুনান আবূ দাউদের হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে সদল করতে (কাপড় দু'পাশে ঝুলিয়ে নামায পড়তে) নিষেধ করেছেন এবং পুরুষকে নামাযরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৭৯৭; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৬৪৩; মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস-৯৪৩; ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৬৬)

প্রশ্ন-০৩: বিতর নামাযে দুআয়ে কুনূত পড়ার বিধান কী? যদি দুআয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকে তাহলে কী পড়বে?

জবাব: বিতর নামাযে দুআয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। নির্দিষ্টভাবে اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك .....ان عذابك بالكفار ملحق পর্যন্ত পড়া সুন্নাত। কারও মুখস্ত না থাকলে মুখস্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। মুখস্ত না হওয়া পর্যন্ত এর পরিবর্তে ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار পর্যন্ত পড়লে চলবে। কিংবা তা না পারলে বলবে- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا -কেউ ভুলে দুআয়ে কুনূত কিংবা বিকল্প কিছু না পড়লে শেষে সাহু সিজদাহ করা ওয়াজিব। আর ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামায হবে না।

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন-

وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقُنُوتَ يَقُولُ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:١٠٢]. كَذَا فِي الْمُحِيطِ أَوْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي اللَّيْثِ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

-যে দুআয়ে কুনূত ভালো করে জানে না সে বলবে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাউ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাউ ওয়াকিনা আযাবান্নার) মুহীত কিতাবে এরূপ লিখেছেন। অথবা বলবে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (আল্লাহুম্মাগফিরলানা) তিনবার বলবে। ইহা আবুল লাইস (র.) চয়ন করেছেন, যা সিরাজিয়াহ কিতাবে রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১১)

আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ دَعَا بِغَيْرِهِ جَازَ . وَلِهَذَا: قَالُوا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُنُوتَ الْمَعْرُوفَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

-ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, কেউ নির্দিষ্ট দুআ তথা "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা" ভিন্ন অন্য দুআ পড়লেও তা বৈধ। আর এজন্য তারা বলেছেন, নির্দিষ্ট দুআ কুনূত যে ভালোরূপে জানে না সে আল্লাহুম্মাগফিরলী বলবে। (বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮-৩১৯)

আল ইখতিয়ার লি তালীলিল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الدُّعَاءَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مِرَارًا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة:١٠٢] الْآيَةَ.

-নির্দিষ্ট দুআ কুনূত যে ভালোরূপে জানে না সে আল্লাহুম্মাগফিরলানা কয়েকবার বলবে, কিংবা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া ... দুআ পড়বে। (আল ইখতিয়ার লি তালীলিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫)

প্রশ্ন-০৪: যুহর ও আসর নামাযে কিরাত মনে মনে পড়া এবং ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে কিরাত জোরে পড়া হয় এর কারণ কী?

জবাব: যুহর ও আসর নামাযে ইমামের মনে মনে কিরাত পড়া এবং অন্যান্য নামাযে তথা ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে কিরাত জোরে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে- মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্ম পদ্ধতির অনুসরণ। এর পিছনে প্রেক্ষাপট এ ছিল যে, প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল নামাযে সজোরে কিরাত পাঠ করতেন, তাই মুশরিকরা কুরআনের আওয়াজ শুনে চলে আসত এবং তাঁকে ব্যাঘাত ও বিরক্ত করার জন্য প্রচুর শব্দ করত। যখন নবী করীম ﷺ উচ্চস্বরে আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন তারা বাজে কথা বলতো এবং তারা

লোকদেরকে সর্বদা এমনটা করার জন্য উৎসাহিত করতো যাতে রাসূল ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ তাদের কানে না পৌঁছে এবং তাদের এহেন আচরণে রাসূল ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যেহেতু কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের বর্ণনা ছিল যা শ্রবণ তাদের সহ্য হত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ নির্দেশনা দিলেন যে, আপনি সকল নামায জোরে কিরাতে কিংবা আস্তে কিরাতে না পড়ে বরং এর মধ্যবর্তি পন্থা অবলম্বন করে রাতের নামাযসমূহ তথা মাগরিব, ইশা ও ফজরে জোরে কিরাত ও দিনের বেলার নামায তথা যুহর ও আসরে আস্তে কিরাত পড়বেন। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব, ইশা ও ফজরে জোরে কিরাত এবং যুহর ও আসরে আস্তে কিরাত পড়তেন। এতে কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ব্যাঘাত করার আর কোন সুযোগ পায়নি। কেননা মাগরিবের সময় তারা পানাহারে রত থাকতো এবং ইশা ও ফজরের সময়ে তারা নিদ্রায় মগ্ন থাকতো। পরবর্তিতে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়ে মুসলমানগণের শক্তি বৃদ্ধি পেলে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ হলেও বর্ণিত আয়াতের বিধান বলবৎ থাকায় কিরাত পাঠের সে নিয়মে কোন পরিবর্তন আসেনি। আর জুমুআ ও ঈদের নামাযের কিরাত জোরে পড়ার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার কারণ হচ্ছে উক্ত নামাযদ্বয় মদীনায় হিজরতের পর সেখানে শুরু হয়েছিল যেখানে দিনের বেলায়ও উপরোক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই ফকীহগণ রাতের নামাযসমূহ যথা- মাগরিব, ইশা ও ফজরে এবং ঈদ ও জুমুআর নামাযে কিরাত পাঠ জোরে ও দিবসের নামায তথা যুহর ও আসর নামাযের কিরাত পাঠ আস্তে পড়া ওয়াজিব বলেছেন। এ সম্পর্কে হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখেছেন-

والأصل في الجهر والإسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:١١٠] أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما ويجهر في المغرب لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار قوة وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم وجهه في الفجر ظاهر وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر

(হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা২৫৩-২৫৪)

প্রশ্ন-০৫: কেউ যদি চাকরি সূত্রে সৌদি আরব থাকাকালীন সময়ে হজ্জ করে, তবে কি তার ফরয হজ্জ আদায় হবে? অনেকেই বলে থাকেন যে, যারা চাকরি সূত্রে সৌদি আরব থেকে হজ্জ করেন, আর যারা বাংলাদেশ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে এসে হজ্জ করেন, এই দুই হজ্জ নাকি সমান নয়। এই কথা কতটুকু সঠিক?

জবাব: মুসলমান সাবালক কারো জীবন-যাপনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকারী হওয়া সহ হজ্জের জন্য দৈহিক, মানসিক, ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে তার উপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয। আর দৈহিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকা এবং হজ্জ আদায়ে প্রতিবন্ধী না হওয়া। আর মানসিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় মানসিক ভারসাম্যহীন বা পাগল না হওয়া। আর আর্থিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় তার অবস্থানস্থল থেকে মক্কাশরীফ যাওয়া -আসা সহ হজ্জের সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য সহ ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার বা তার অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের সামর্থ্যের অধিকারী হওয়া। এর বর্ণনায় বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবে লিখেছেন-

الحج وَاجِب على الْأَحْرَار الْبَالِغين الْعُقَلَاء الأصحاء إِذا قدرُوا على الزَّاد وَالرَّاحِلَة فَاضلا عَن الْمسكن وَمَا لَا بُد مِنْهُ وَعَن نَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده وَكَانَ الطَّرِيق آمنا

(বিদায়াতুল মুবতাদী, পৃষ্ঠা-৪২)

খাজানাতুল মুফতীন কিতাবে লিখেছেন-

فالحاصل أنّه يجب على كلّ حُرّ، مسلم، مكلّف، صحيح، بصير، له زادٌ وراحلةٌ، فضلاً عما لا بدّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق، والزوج أو المحرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر، مرةً على الفور

(খাজানাতুল মুফতীন, পৃষ্ঠা-১০৫৯)

অনুরূপ শারহুল বিকায়াহ সহ অন্যান্য ফিকহের কিতাবে লিখেছেন-

يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيح بصيرٍ، له زادٌ وراحلة فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ،

(শারহুল বিকায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫১)

সুতরাং উপরিবর্ণিত শর্তাবলী পূর্ণ হলে যেকোন ব্যক্তির জন্য হজ্জ আদায় ফরয, চাই সে আবাসে থাকুক কিংবা প্রবাসে। আর নিজের স্থায়ী বাসস্থান থেকে হজ্জ আদায় এবং প্রবাস থেকে হজ্জ আদায়ে যেমন বিধানগত কোন তফাত নেই তেমনি সাওয়াবের ক্ষেত্রে তফাত না থাকাই যুক্তিযুক্ত। তাই যারা এতদুভয়ের মধ্যে সাওয়াবের পার্থক্য রয়েছে বলে দাবি করেন, তাদের দাবি অযৌক্তিক ও দলীল বহির্ভূত।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

“ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ

অক্টোবর মাস নানা বিষয় নিয়েই ছিল উত্তপ্ত। রাজনৈতিক টানাপোড়েন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এ মাসেও দেশ সরগরম ছিল। এ মাসের ৮ তারিখ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাস পেরোয়। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতা বিপ্লব করে শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলের অবসান ঘটিয়ে দেশকে মুক্ত করে। ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাত্র-জনতার বিপুল সমর্থন নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দেশকে পুনর্গঠনে নানা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখা যায় । বিগত অক্টোবর মাসে এ সরকার জনকল্যাণে নানা সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে, যার কোনটি সাধুবাদ পেলেও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়।

গত ২৩ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯' এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে।" এছাড়াও জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে হত্যা ও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগও আনা হয়। তবে এর পূর্বে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইস্যুতে দেশে তুমুল আলোচনা তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এর একটি বক্তব্যকে ঘিরেই আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। গত ২০ অক্টোবর দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার রাজনৈতিক ম্যাগাজিন 'জনতার চোখ'—এ প্রকাশিত কথোপকথনে দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপকালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্রের বিষয়ে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপতি তাকে বলেন, "তিনি শুনেছেন যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর কাছে এর কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই।" বক্তব্যটি সামনে আসার পরপরই সারাদেশে তুমুল আলোচনার ঝড় ওঠে। তার পদত্যাগের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহ বিভিন্ন সংগঠন বঙ্গভবন ঘেরাও করে। আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে "মিথ্যাচার এবং শপথ লঙ্ঘনের শামিল" বলে উল্লেখ করেন। সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ কিছুটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেন, "চুপ্পু মাস্ট গো।" তবে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি সংবিধানের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের আলোচনা চলাকালীনই ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের ঘোষণা আসে সরকারের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নির্বাচন ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রশ্নে অনেক রাজনৈতিক দল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন বা পিআর পদ্ধতিতে ভোটের দাবিও তুলছেন। সম্প্রতি এ নিয়ে একটি সেমিনারে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টিসহ অনেক রাজনৈতিক দল আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোটের পক্ষে দাবি তুলেছে। আনুপাতিক পদ্ধতি হচ্ছে নির্বাচনি ব্যবস্থার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আসন বণ্টন হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। যেমন- যদি কোন দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১০ শতাংশ পায়, তাহলে সেই দল আনুপাতিক হারে সংসদের ১০ শতাংশ বা ৩০টি আসন পাবেন। তবে এক্ষেত্রেও বিএনপি এই পদ্ধতির বিরোধিতা করে প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষেই অবস্থান করছে। এমন বড় একটি রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব কি না সেটি নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও আনুপাতিক পদ্ধতির বিরোধিতার মতো ইস্যুতে বিএনপির এমন বিপরীতমুখী অবস্থান দলটির সাথে সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দূরত্বের বহিঃপ্রকাশ কি না তা নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্নবোধক একটি চিহ্নই সামনে আসছে।

দেশের এই পরিস্থিতির মধ্যেও একটি বিশেষ সমাবেশ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশের সনাতন সম্প্রদায় তাদের আট দফা দাবি আদায়ের জন্য চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ২৫ অক্টোবর বিশাল সমাবেশে করে। হঠাৎ করে এমন সমাবেশের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। ওই সমাবেশ থেকে উদ্ভূত ৮ দফা দাবি আদায়ের জন্য ঢাকা অভিমুখে লংমার্চের যে ঘোষণা দিয়েছে সেটিও অনেকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওই সমাবেশের প্রধান বক্তা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর একটি বক্তব্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তিনি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "আমরা এখন রাস্তায় নেমেছি কারণ এখন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। তবে কিছু ঘটনা আমাদের বিচলিত করেছে। আগে বাড়িঘর মন্দির বা ব্যক্তির ওপর হামলা হয়েছে নিয়মিত। এখন জীবিকায় হাত দেওয়া হচ্ছে। শুধু হিন্দু বলেই চাকরিচ্যুত ও পদাবনতির ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অনুষ্ঠানে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। এসব কারণে আমাদের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।" বাংলাদেশে সবসময়ই ধর্মীয় একটি সম্প্রীতি বহমান ছিল। বিভিন্ন সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির বা উপসনালয়ে হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার প্রমাণও মিলেছে। সেজন্য বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে সমাধানের উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেননা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টের ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব রাখে। এসব বিষয় ছাড়াও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বয়স ৩২ পুনঃনির্ধারণ, সবজি ও নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা সহ নানা ইস্যুতে অক্টোবর মাসে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল গত ১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়। এ বছর পাসের হার ৭৭.৭৮% সকল বোর্ডের ফলাফল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে একযোগে প্রকাশ করা হয়। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় গত ৩০ জুন। সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এরপর প্রথমে ১১ আগস্ট ও পরে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলো নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আগস্টে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবারের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় যেসব বিষয়ের পরীক্ষা ইতোমধ্যে হয়ে গিয়েছে, সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আর যেসব বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, সেগুলোর ফলাফল বিষয় ম্যাপিং করে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে। বিষয় ম্যাপিংয়ের আলাদা নীতিমালা আছে। এ প্রক্রিয়ায় একজন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে একটি বিষয়ে যত নম্বর পেয়েছিলেন, এইচএসসিতে সেই বিষয় থাকলে তাতে এসএসসিতে প্রাপ্ত পুরো নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হবে। আর এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় বিষয়ে ভিন্নতা থাকলে ম্যাপিংয়ের নীতিমালা অনুযায়ী নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এ পদ্ধতিতে এবছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সালে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা না নিয়েই এসএসসি/সমমান ও জেএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সব পরীক্ষার্থীদের অটোপাশ দেওয়া হয়েছিল।

গত অক্টোবর মাসের শুরুটা হয়েছিল ইরান কর্তৃক ইসরায়েলের অভ্যন্তরে মিসাইল হামলার মধ্য দিয়ে। এর আগে ইরান আরো একবার ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে হামলা করলেও এই সংঘাতের শুরু হয় গত এপ্রিলে সিরিয়ায় ইরানের দূতালয়ে হামলার মধ্য দিয়ে। আর এই পুরো বিষয়টা গত বছর অক্টোবরে সূচিত যে আল আকসার তুফানের সাথে সম্পৃক্ত, তা তো বলাই বাহুল্য। সিরিয়ায় ইরানি দূতালয়ে হামলার পর ইরান পাল্টা জবাবে খুব সামান্য পরিসরে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা চালায় গত এপ্রিলে, যেটি আকারে ছোট হলেও সরাসরি ইরান কর্তৃক ইসরায়েলে প্রথম হামলা হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হচ্ছিল। এরপর বিভিন্ন সময় ইসরায়েলের উস্কানি সত্ত্বেও ইরান আর কোন হামলা না করলেও গত ৩১ জুলাই তেহরানে ইরানের রাষ্ট্রীয় অতিথি তৎকালীন হামাস প্রধান ইসমাঈল হানিয়্যাকে শহীদ করার পর ইরানের জন্য পাল্টা হামলা না করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই খোলা থাকেনি। তখন থেকে সকলের অপেক্ষা ছিল ইরান কখন পাল্টা জবাব দেয়, অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটে অক্টোবরের প্রথম দিন, ইসরায়েলে ভূমিতে ইরানের মিসাইল হামলার মধ্য দিয়ে। দুই দফায় ইরান সেদিন প্রায় ২০০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে। বেশিরভাগ মিসাইল মার্কিন নৌবাহিনী ও জর্ডানিয়ান বাহিনী এবং ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আটকে দিলেও বেশ কয়েকটি মিসাইল ইসরায়েলের মাটিতে আঘাত হানে। এতে এক ফিলিস্তিনী এবং ইসরায়েলির মৃত্যু ঘটে, আহত জর্ডান এবং ইসরায়েলের কয়েকজন নাগরিক।

এই হামলার পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্য বিষয় ছিল ইসরায়েল এর জবাব কীভাবে দেবে, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা করবে, নাকি তেলের খনিতে হামলা করবে? অবশ্য শেষ পর্যন্ত এর কোনটিই ঘটেনি, গত ২৬ অক্টোবর ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালায়, যদিও হামলার কয়েক ঘন্টা আগে সূত্র মারফত ইরানকে সতর্কও করেছিল। এই হামলায় ইরানের ভাষ্যমতে দুই এবং ইসরায়েলের ভাষ্যমতে চারজন নিহত হয়েছেন। ইরান ইসরায়েলের উপর তাদের প্রথম দুটি হামলাকে "সত্য প্রতিশ্রুতি-১ ও ২" নামে আখ্যায়িত করে এবং ইসরায়েলের এই হামলার পর সত্য প্রতিশ্রুতি- ৩ এর বিষয়েও আলোচনা শুরু করে। তবে ইসরায়েল যতটা তীব্র আক্রমণ করবে বলে হম্বিতম্বি করেছিল, তার কিছুই করেনি, সম্ভবত সরাসরি ইরানের সাথে পূর্ণ যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়ে মার্কিন সবুজ সংকেত না পাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

এদিকে অক্টোবরের ১৬ তারিখ ইসরায়েলীদের হাতে ইয়াহইয়া সিনওয়ারের শাহাদত গাযায় চলমান যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইসমাঈল হানিয়্যার পর সিনওয়ারকে হামাস প্রধান নির্বাচিত করা হলেও সিনওয়ারের মৃত্যুর পর হামাস আর নতুন করে কোন একক প্রধান নির্বাচন করেনি, বরং কাতার ভিত্তিক হামাসের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী কমিটিই হামাসের কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মার্চে রুটিন মাফিক হামাসের নতুন প্রধান নির্বাচিত করা হতে পারে। হামাস আপাতত নতুন নেতা নিযুক্ত না করলেও গত ২৯ অক্টোবর লেবাননের হিযবুল্লাহ তাদের নতুন মহাসচিবের নাম ঘোষণা করেছে। হিযবুল্লাহ নাইম কাসিমকে হাসান নাসরুল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করেছে।

এদিকে অক্টোবরের ১ তারিখ ইসরায়েল কর্তৃক লেবাননে অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে লেবানন-ইসরায়েল সংঘর্ষ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আল আকসার তুফান শুরু হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েলের সাথে লেবাননের সংঘর্ষ চললেও অক্টোবরের শুরুতে ইসরায়েল কর্তৃক লেবানন সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই সংঘর্ষ আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এর ফলে লেবাননের সীমানার ভিতরে যেমন স্থলযুদ্ধ শুরু হয়, তেমনি ইসরায়েলের হাইফা, আক্কা এমনকি তেল আবিবও অনিরাপদ হয়ে পড়ে। খোদ ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বাড়িতে হিযবুল্লাহ হামলা করতে সক্ষম হয়েছে, যদিও তাতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেবল স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তেল আবিবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হামলা ইসরায়েলকে বড় ধরনের হুমকিতে ফেলেছে। এদিকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে তেল আবিবে মোসাদ সদরদপ্তরের নিকটে এক আরব ট্রাক ড্রাইভার কর্তৃক বাসে আক্রমণের ফলে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ইসরায়েলের নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রশ্নটিকে আরো জোরালো করে তুলেছে। এর ফলে ইসরায়েলী সেনা সদস্যসহ অসংখ্য নাগরিকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশটির উগ্রপন্থী মন্ত্রী বেনগাফির নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার বিষয়টিতে আবারো জোর দিচ্ছেন, যা দেশটির আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এরকম পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান দুই নেতা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ভূগর্ভস্থ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বলে বিভিন্ন ইসরায়েলী গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, ইয়াহইয়া সিনওয়ার গাযার বেসামরিক মানুষকে ফেলে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙে আছেন এমন অপপ্রচার সিনওয়ারের শাহাদাতের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর নেতানিয়াহুর ভূগর্ভস্থ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। তদুপরি লেবানন সীমান্তের অবৈধ বসতিসমূহে ইসরায়েলী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে লেবাননে আক্রমণ করে এখন নিজেই নিজের বাসভবনে ফিরতে না পারার বিষয়টিও ইসরায়েলে এবং আরববিশ্বে তুমুল আলোচনা সৃষ্টি করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে মূল দুই প্রার্থীই ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতি নিজেদের সমর্থন অব্যাহত রাখার স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার ফলে আরব, মুসলিম তথা মানবাধিকারের পক্ষের ভোটারদের জন্য এ নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে বাছাই করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। ডেমক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস মুসলিমে ও আরব ভোটারদের সমর্থন হারানোর ফলে ট্রাম্পের বিজয় কিছুটা সহজ হতে পারে, যা ফিলিস্তিনের পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। কমলা হ্যারিস নির্বাচিত হলেও ইসরায়েলের বিপক্ষে খুব বড় কোন ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতি আরো ভয়াবহ হবে বলে বিশ্লেষকদের আশঙ্কা। মার্কিন দ্বিদলীয় গণতন্ত্রে এই দুই প্রার্থী ছাড়া অন্য যেসকল প্রার্থী রয়েছেন তাদের পক্ষে নির্বাচনে কোন প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা না থাকলেও অনেক মুসলিম ভোটার তৃতীয় প্রার্থী বেছে নেওয়ার চিন্তা করছেন, অন্যদিকে ইসরায়েল ও জায়োনিস্ট লবি প্রকাশ্যে ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

কবিতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নিয়ে বিদ্রুপ করার শাস্তি

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.)

কাব্যানুবাদঃ মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান

মুখ বাঁকাল এক অভাগা
নাম নিয়ে পাক মুস্তফার
পরিণামে তেমনি বাঁকা
রয়ে গেল মুখটি তার।

ভয় পেয়ে সে তাওবা করে
গেল নবীর দরবারে
করল আরয, দয়াল নবী
দিন আমাকে মাফ করে।

'ইলমে লাদুন্নির' হে রাসূল
আপনিতো মহাভান্ডার
আপনি জানেন, আপনি ক্ষমা
করুন কসুর এ বান্দার।

ব্যঙ্গ করেছিলাম আমি
পাচ্ছি সাজা সেই পাপের
আমি এখন বনে গেছি
পাত্র সবার বিদ্রুপের।

সকাতরে এরূপ ক্ষমা
চাইল যখন সেই জনা
দয়াল নবী তখন তাকে
করে দিলেন মার্জনা।

আল্লাহ যখন চান কাহারো
যিল্লতি, বে-ইযযতি
ইচ্ছা জাগে অন্তরে তার
করতে সাধুর বদনামি।

আবার যখন চাহেন খোদা
রাখতে কারো দোষ গোপন
অন্বেষণে দোষ অপরের রোধে
রাখেন তাহার মন।

মদদ করার ইচ্ছা কারো
করলে খোদা মেহেরবান
অন্তরে তার রোনাজারির
ইচ্ছা ও ঝোঁক করেন দান।

ধন্য সে চোখ যে চোখ কাঁদে
খোদার প্রেমে সর্বক্ষণ
ধন্য সে মন– বিচ্ছেদে তাঁর
ভুনা ভুনা হয় যে মন।

শেষ অবধি পাবে সে সুখ
কেঁদেছে যার দুই নয়ান
পরিণতির চিন্তা করে যে জন
সে হয় ভাগ্যবান।

হেথায় হয় শ্যামল সবুজ
পানির ধারা যেই খানে
অশ্রু যেথা ঝরে চোখের
খোদার দয়া সেই খানে।

শস্য ক্ষেতের সেচের মতো
দাও আঁসু-সেচ অন্তরে
হাসবে শ্যামল সবুজ বাগান
তোমার হৃদয় কন্দরে।

নিজের তরে চাইলে আঁসু
পরের তরে অশ্রু দাও
রহম করো দুঃখীর পরে
যদি খোদার রহম চাও।



আসহাবে উখদূদ

বহুকাল আগে পৃথিবীতে একজন রাজা ছিল। যার একজন বিশ্বস্ত গণক ছিল, যে যাদু বিদ্যায়ও পারদর্শী। সেই যাদুকর যখন অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন সে একদিন রাজাকে বললো, মহামান্য রাজা, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার সময় প্রায় শেষ, আমাকে একটি মেধাবী ছেলে দিন যাতে আমি তাকে যাদুবিদ্যা শেখাতে পারি। রাজা তার কাছে একটি বুদ্ধিমান ছেলেকে পাঠালেন। যাদুকর তাকে যাদু শেখাতে লাগলো। ছেলেটি প্রতিদিন যে পথ দিয়ে যাদুকরের কাছে যেতো সে পথের ধারে একজন ধর্মযাজক বসবাস করতেন। ছেলেটি যাদুকরের কাছে যাওয়া-আসার সময় ঐ ধর্মযাজকের নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ বসতো। তার কথাবার্তা মনযোগ সহকারে শুনতো এবং অবাক হতো। তিনি তাকে আল্লাহ ও তার সত্য দ্বীনের সবক দিতে লাগলেন। এরকমভাবে প্রতিদিন সে ধর্মযাজকের নিকট সময় কাটানোর ফলে যাদুকরের কাছে যেতে-আসতে মাঝেমধ্যে তার দেরি হয়ে যেত, তাই যাদুকর তাকে মারধর করত। ছেলেটি এ বিষয়ে সন্ন্যাসীকে জানালে তিনি তাকে বললেন, দেরিতে যাওয়ার কারণে যাদুকর তোমাকে মারতে চাইলে তুমি বলবে, রাজপ্রাসাদের লোকদের সাথে আমি ব্যস্ত ছিলাম। রাজপ্রসাদের লোকেরা যখন তোমার ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইবে তখন বলবে, যাদুকর আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। এভাবেই সে হিকমাত অবলম্বন করে ধর্মযাজকের কাছে একত্ববাদের তালীম নিতে লাগলো। একদিন একটি বিশালদেহী ভয়ঙ্কর প্রাণী রাস্তায় এসে মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়। ছেলেটি তখন ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে চিন্তা করলো, আজ আমি পরীক্ষা করবো যাদুকর সত্য নাকি ধর্মযাজক সত্য। সে একটি পাথরের টুকরো হাতে নিলো এবং প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ! যদি যাদুকরের চেয়ে ধর্মযাজকের আমল তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয় হয় তবে বিশাল প্রাণীটিকে সামান্য এই পাথরের আঘাতে মেরে ফেলো; যাতে লোকেরা রাস্তা পার হতে পারে। এই বলে সে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়লো, আল্লাহর কী অপার মহিমা– সামান্য পাথরের আঘাতে বিশালদেহী প্রাণীটি জায়গাতেই মারা যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ছেলেটি দৌড়ে এসে ধর্মযাজককে ঘটনার বিস্তারিত বললো। সব শুনে ধর্মযাজক বললেন, হে বৎস! আজ দেখছি তুমি পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে গেছো। এবার তোমার কঠিন পরীক্ষা শুরু হবে কিন্তু কোনোভাবেই তুমি আমার নাম প্রকাশ করবে না।

ছেলেটি আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখার শর্তে অন্ধত্ব, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করতে শুরু করলো। সে বলতো, আমি কাউকে নিরাময় করি না; নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন অর্থাৎ (ঈমান আনেন) এবং প্রার্থনা করেন তবে তিনি আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। এই শর্তানুযায়ী রাজার এক সহচরের অন্ধ চোখ সে আল্লাহর দরবারে দুআ করে ভালো করে দিলো। সহচর রাজার কাছে ফিরে আসলে রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে? সহচর বলতে না চাইলে রাজা রাগান্বিত হয়ে তাকে নির্যাতন করতে থাকেন। বাধ্য হয়ে সহচর আল্লাহর প্রতি তার ঈমান আনার ঘটনা প্রকাশ করলো। রাজা তখন প্রচন্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তিনি তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। রাজা লোক পাঠিয়ে ছেলেটিকে ধরে আনলেন এবং তাকে তার বিশ্বাস (ঈমান) ত্যাগ করার জন্য বললেন। ছেলেটি তাতে অসম্মতি জানালো। তখন তিনি আদেশ দিলেন এই ছেলেটিকে উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে হত্যা করতে। কয়েকজন লোক তাকে ধরে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলো। সে আল্লাহর কাছে দুআ করলে পাহাড় কাঁপতে লাগলো। ফলে, সে ছাড়া অন্যরা পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে মারা গেল। এরপর রাজা আবার ছেলেটিকে সমুদ্রের মাঝখানে ডুবিয়ে মারার জন্য কয়েকজন লোককে দায়িত্ব দিলেন। সেখানেও তার দুআর বদৌলতে নৌকাটি উলটে সে ছাড়া অন্যরা সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। রাজা বিভিন্নভাবে একাধিকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আল্লাহ প্রতিবার তাকে রক্ষা করলেন। অবশেষে, ছেলেটি রাজাকে বলল, আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না আপনি আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন।

–রাজা বললেন, সেটা কী?

–ছেলেটি বললো, আমাকে হত্যা করতে চাইলে জনসম্মুখে 'বিসমি রাব্বিল গুলাম' অর্থাৎ (এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তির মারতে হবে; তাতেই আমি মারা যাবো। আল্লাহর নাম নেয়া ছাড়া আপনি কোনোভাবেই আমাকে মারতে পারবেন না।

রাগে-অপমানে প্রচণ্ড ক্ষোভে আগপিছ কিছু চিন্তা না করে রাজা তা-ই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

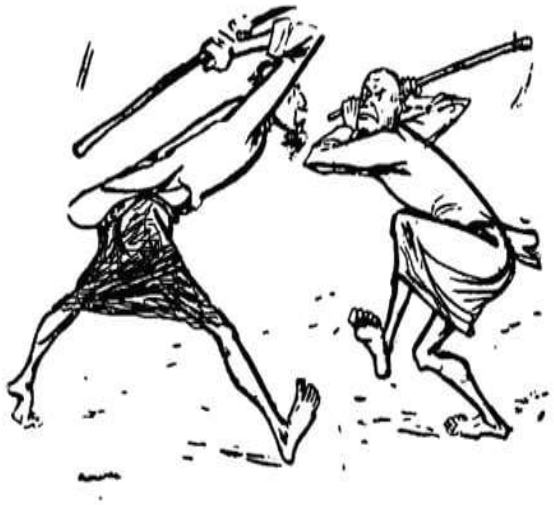
আয়োজন করে জনসম্মুখে 'বিসমি রাব্বিল গুলাম' বলে তির মেরে ছেলেটিকে হত্যা করা হলো। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তখন উপস্থিত জনতা সবাই চিৎকার করে বলে উঠলো, এই ছেলেটি হকের পথে ছিল, আমরা তার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। অথচ, রাজা ভেবেছিলেন ছেলেটিকে হত্যা করলেই মানুষ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত থাকবে। কেউ আর তার ধর্ম ত্যাগ করে একত্ববাদ খোদার ধর্ম গ্রহণ করবে না। কিন্তু রাজার চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। রাজার সভাসদগণ বললো, আপনি যেজন্য ভয় পেয়েছিলেন এখন তো দেখি সেটাই হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে রাজা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। আদেশ করলেন, রাস্তার পাশে বিশাল গর্ত খনন করে তাতে আগুন দাও। যারা ঈমান ত্যাগ করবে না তাদেরকে এই গর্তে নিক্ষেপ করো। তখন যারা ঈমান ত্যাগ করলো তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং যারা ঈমান ত্যাগ করলো না তাদেরকে গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। এসময় এক ঈমানদার মহিলা আগুন দেখে ভয়ে প্রকম্পিত হলে তার কোলের শিশুটি বলে উঠলো, মা! আপনি ঘাবড়াবেন না, আপনি তো সত্যের উপরে আছেন। তখন সে মহিলাটিও আগুনে ঝাঁপ দিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক সেসব মুমীন নর-নারীর শরীরে আগুনের তাপ লাগার আগেই তাদের রুহু কবয করেন। ফলে, এই অগ্নিকুন্ড থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করেন। এবং সেখানে যারা তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে এসেছিল আল্লাহর ইঙ্গিতে ওই অগ্নিকুন্ড হঠাৎ প্রবল আকার ধারণ করে তাদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

"যে কুন্ডে ছিল ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা (গর্তের) কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে (মুমিনদেরকে) নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী আল্লাহ।" (সূরা বুরুজ, আয়াত: ৫-৮)

(তাফসীরে ইবন জারীর, তাফসীরে ইবন কাসীর সহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আসহাবে উখদূদের গল্পটি মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য সংকলন করেছেন জামান আহমদ।–*বিভাগীয় সম্পাদক*)

এক কথায় এত কিছু

পল্লীকবি জসীম উদ্দীন



শ্বশুরবাড়ি গিয়ে জামাই কোনো কথা বলে না। শালীরা-শালারা কত ঠাট্টা-তামাসা করতে আসে; সে কোনো উচ্চবাচ্য করে না । তখন শ্বশুর গিয়ে জামাইয়ের বাপকে বলে, দেখুন, আপনার ছেলে আমাদের বাড়ি এসে চুপ করে বসে থাকে। কোনো কথাবার্তা বলে না। এটা যেন কেমন কেমন লাগে। সবাই বলে জামাই বোকা। বাপ বলল, আমার ছেলে তো বাড়িতে বেশ ভালোমতোই কথাবার্তা বলে! আচ্ছা, তাকে আমি বেশ করে ধমকিয়ে দিব।

বাড়ি এসে বাবা ছেলেকে ডেকে বলল, কী রে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কথাবার্তা বলিস না কেন? সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবি। শালা-শালীদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করবি। তবেই না লোকে বলবে, বেশ ভালো জামাই! ছেলে মাথা নত করে রইল। বাবা বুঝল, এবার ছেলে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তার উপদেশ মতো কাজ করবে।ঈদের ছুটিতে জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। এসে বৈঠক খানার এক কোণে চুপচাপ বসে আছে।

শ্বশুর এসে জিজ্ঞাসা করল, কী বাবাজী! চুপ করে বসে আছ কেন? বাড়িতে সবাই ভালো আছে তো? জামাই উত্তর করল, ভালো আর আছে কই? কয়েকদিন হল, আমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে যাকে দেখেন তাকেই মারতে আসেন। শ্বশুর বলল, তবে তো খুব খারাপ কথা! আমি কালই তোমার বাবাকে দেখতে যাব।

জামাই বলল, শ্বশুর সাহেব! যাবেন যে, খুব সাবধানে যাবেন। একখানা লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে যাবেন। আমার বাবা যদি আপনাকে মারতে আসেন, লাঠি উঠিয়ে তাঁকে মারতে যাবেন! দুই একটা লাঠির ঘা মাথায় পড়লে বাবা শান্ত হয়ে যাবে। তারপর আর কিছু বলবেন না। শ্বশুর বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই করব। কাল সকালেই তোমার বাবাকে দেখতে যাব।

জামাই শ্বশুরবাড়ি হতে ফিরে আসল। বাপ জিজ্ঞাসা করল, কী রে, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসলি যে? ছেলে বলল, ফিরে না এসে উপায় কী? আমার শ্বশুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাকে দেখেন তাকেই লাঠি ঘুরিয়ে মারতে আসেন। বাপ বলল, তবে তো খুব খারাপ খবর! কাল সকালে তোর শ্বশুরকে দেখতে যাব।

ছেলে বলল, আপনি যে যাবেন, খুব সাবধানে যাবেন। একখানা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে যাবেন। আমার শ্বশুর যদি আপনাকে মারতে আসেন, লাঠির কায়েক ঘা তাঁহার গায়ে মারবেন, তিনি তখনই থেমে যাবেন। কিন্তু কয়েক ঘা না মারলে তিনি আপনাকে মারতেই থাকবেন। সাবধান! সঙ্গে লাঠি না নিয়ে যাবেন না।

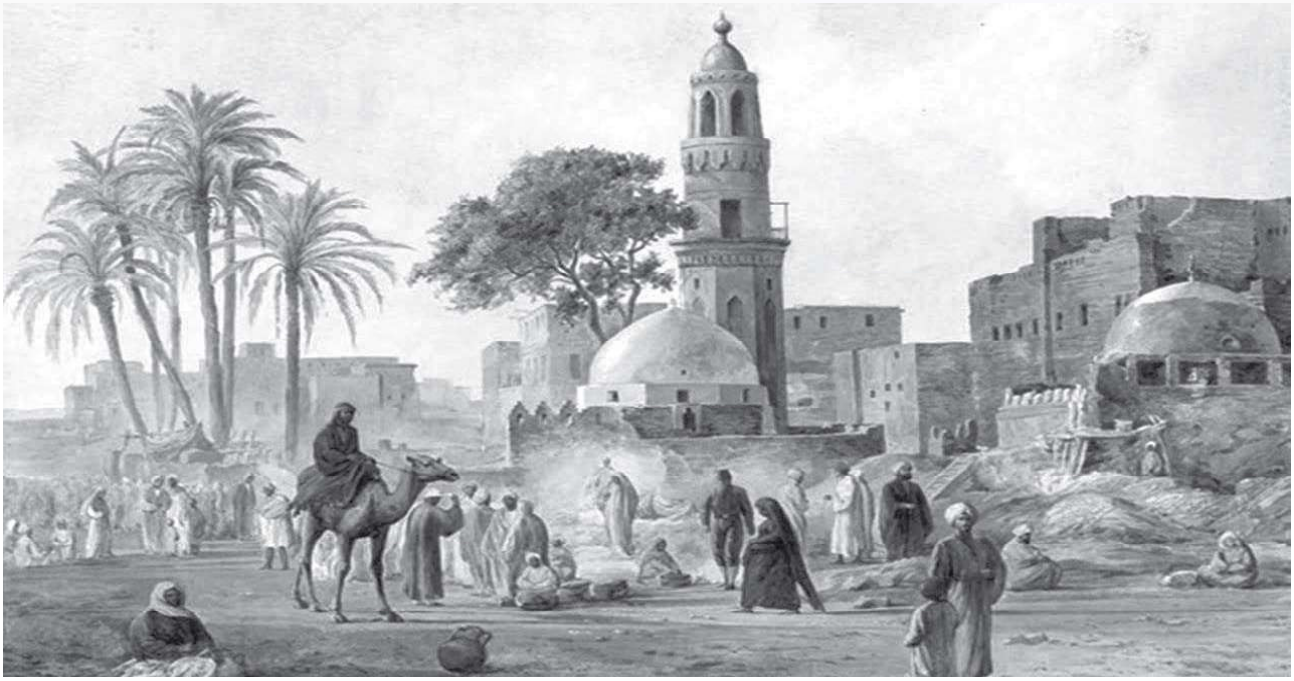
পরদিন সকালে দুই গ্রাম হতে বাপ আর শ্বশুর লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে বাহির হল। মাঝপথে এসে দুই বিয়াইয়ের সাথে দেখা হল।শ্বশুর লাঠি উঁচিয়ে বলল, এই! বাপ তেমনি লাঠি ঘুরিয়ে বলল, এই! তারপর দুই বিয়াইতে লাঠি পেটাপেটি আরম্ভ হল। সে কি যেমন তেমন মারামারি! পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে দুই বিয়াইকে আলাদা করে ধরে রাখল।

তারপর বলল, তোমাদের হল কী? দুই বিয়াইয়ের মধ্যে এমন ভাব-মহব্বত। আর এখন এইভাবে তোমাদের মারামারি করার কারণ কী? শ্বশুর তখন বলল, কাল জামাইয়ের মুখে শুনলাম বিয়াই নাকি পাগল হয়ে গেছে। যাকে দেখে তাকেই মারতে আসে। আর লাঠি দিয়ে দুই এক ঘা মারলেই নাকি নীরব হয়ে যায়। বাপ বলল, ওই শয়তান ছেলে বিয়াইয়ের বিষয়েও আমাকে এমন কথা বাড়ি এসে বলেছে।

এখন এ-বিয়াই ও-বিয়াই একে অপরের সঙ্গে আলাপ করে সমস্ত জানতে পারল। বাপ বাড়ি ফিরে ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, ওরে শয়তান, বেহায়া! তোর শ্বশুর সম্বন্ধে এমন মিথ্যা কথা আমাকে বলেছিলি কেন? ছেলে বিনীতভাবে উত্তর করল, আপনি আমাকে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কথাবার্তা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেখানে গিয়ে একটি মাত্র কথা বলেছি, তাতেই এত! আর অনেক কথা বললে না জানি কি হত?

উট

মুহাম্মাদ উসমান গণি



অর্ধ জাহানের খলীফা। চষে বেড়াতেন গ্রাম থেকে গঞ্জ, শহর থেকে বন্দরে। যেভাবে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখতে ছুটে বেড়াতেন রাত কী বা দিনে, ঠিক তেমনি বাজার ঘুরে ঘুরে দেখতেন ভোক্তা অধিকারে কোনো ব্যাঘাত ঘটছে কি না। একদিন বিকেলে বের হলেন বাজার পরিদর্শনে। ঘুরে ঘুরে দেখছেন হরেক রকম দ্রব্যাদি বিক্রির দৃশ্য। দেখছেন ব্যবসায়ীদের সততা আর বাস্তবতা। দেখছেন নানান শ্রেণি পেশার মানুষের কেনাকাটার দৃশ্য। কেউবা সওদা নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে কেউবা সবেমাত্র কেনাকাটা শুরু করেছে। কেউবা আবার দরদাম অবলোকন করছে। এভাবেই পুরো বাজার ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব। চলতে চলতে সামনে পড়লো উটের বিশাল লাইন। তিনি এগিয়ে গেলেন উটের লাইনকে লক্ষ্য করে। দেখলেন সেখানে চলছে উট বেচা-কেনা। তিনি একটা একটা করে উটগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ একটি হৃষ্টপুষ্ট ও মোটাতাজা উটের দিকে তাঁর চোখ যায়। এগিয়ে যান উটটির দিকে। উটের গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন, যদি সবাই এভাবে উটের যত্ন নিতো তাহলে অন্যান্য উটগুলোও এমন স্বাস্থ্যবান হতো। খলীফা খুশি হয়ে এই উটের মালিককে খুঁজলেন। লোকেরা তড়িগড়ি করে উটের মালিককে হাযির করে খলীফার সম্মুখে। উটের মালিক হাযির হতেই ঘটে যায় আশ্চর্যজনক ঘটনা। খলীফা ও উটের মালিক দুজনই নিস্তব্ধ। আশপাশের লোকজন অপলকে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। সকল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে খলীফার দারাজ কণ্ঠ, আব্দুল্লাহ! এ উট তুমি কোথায় পেলে?

আব্দুল্লাহ খুব মৃদু স্বরে জবাব দেয় এটি আমারই।

অনেক আগে আমি এটি কিনেছিলাম। আর চারণভূমিতে ঘাস খাইয়েছি এবং বিশেষ সেবাযত্ন করে এটিকে মোটাতাজা করেছি।

খলীফার চেহারায় রাগের প্রতিকৃতি। তিনি আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন বাছা শোন! তুমি যা করেছো অন্যায় করেছো। আর খোদ খলীফা পুত্র হিসেবে তা আরও গুরুতর। তুমি যে চারণভূমিতে উটকে ঘাস খাইয়েছো তা সরকারি সম্পত্তি। এটি তোমার বা তোমার পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আর জনগণের সম্পত্তিতে তোমার ব্যক্তিগত উট চড়ানোর অধিকার নেই। এতক্ষণে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়ে যায় উটের বাজারে। খলীফা এবার ঘোষণা দিলেন, তুমি উটটি ন্যায্য দামে বিক্রি করবে। উটের মূল্য তুমি পাবে ঠিক কিন্তু বাড়তি মুনাফা জমা দিতে হবে সরকারি কোষাগারে। কারণ তুমি সরকারি চারণভূমিতে তোমার উটকে ঘাস খাইয়ে মোটাতাজা করেছো। খলীফা পুত্র নীরবে পিতার কথাগুলো শুনলেন এবং মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আশপাশের লোকজন বলাবলি করতে লাগলো এই হলেন আমাদের খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব। P

জুলাই বিপ্লব
মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

রাষ্ট্রযন্ত্র মোর দখলে
রাখতে হবে ভাই
আপন দলের নেতাকর্মী
করবে যে বড়াই।

দীর্ঘ জীবন থাকাটা চাই
রাষ্ট্র ক্ষমতায়
হোক ক্রীতদাস দেশের মানুষ
কীই বা আসে যায়।

জনগণের ধার ধারি না
ধার ধারি না ভোটের
দেশ দিয়েছে আমার বাবা
নায়ক আমি লুটের।

এই মনোভাব রাজনীতিতে
ডাকলো সর্বনাশ
জুলাই বিপ্লব বলে দিছে
আর না এমন আশ।

আহবান
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

জাগতে হবে এবার সবাই
লড়তে হবে শুনরে ভাই
সিংহ নাদে বাঁচলি নারে
এমন বাঁচার কোন বড়াই।

স্রোতের তালে বাঁচার চেয়ে
বিড়াল ছানার সঙ্গী হও
সৈয়দপুরের রক্ত থেকে
জন্ম নেয়া কেমনি কও।

শুদ্ধ নিয়ত তৈরী করে
দ্বীন কায়িমের আন্দোলন
ইহ-পরপারের প্রেমে
গর্জে ওঠ মুমিনগণ।

এখন সময় জাগার সময়
মিছিল মিটিং সংগ্রামে
মরলে শহীদ বাঁচলে গাযী
বাঁচবো যে বীর বিক্রমে।

সময়ের আক্ষেপ-৯
এস এম মনোয়ার হোসেন

এখন বুঝি মূল্য খুজি
করছি শত ভুল
পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে
খুঁজছি কী মাশুল?

খুব নীরবে মনের কোণে
দেয় যে পাপে নাড়া
রাত শেষে দিন হয় জীবনে
ক্ষমার যে খুব তাড়া।

গোনার বোঝা ভীষণ ভারী
চাই যে সদা মাফ
সকল গুনাহ যাক মুছে যাক
দীল হয়ে যাক সাফ।

যদি না যায় কলবের জং
বাড়বে দীলে জখম
কেমন করে পার পাবো যে
লভি খোদার রহম।

পরম ছায়ায় আগলে রেখো
করো শান্তিময়
বেলা শেষে ভালো কাজের
হিসাব যেনো রয়।

রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ
ইয়াকুব আহমদ

কোন সে নবী আসায় ভবে
আঁধার পালায় দূর
কোন সে রহম ধরায় এসে
জ্বালিয়ে দিলেন নূর।

কোন সে মহামানব এসে
বলেন খোদা এক
সূর্য এবং মূর্তিপূজায়
হয় না লেখা নেক।

কোন সে নবী এলেন বলে
হাসলো প্রাণী কুল
আঁধার ঘোরে মজে থাকা
ভাঙলো সবার ভুল।

কোন সে নবী ছড়িয়ে দিলেন
পাক কালিমার সুর
যে কালিমা করে দিল
কুফরী যত চূর!

কোন সে নবী আসার পরে
কাঁদলো আযাযীল
আজও কাঁদে কোন সে জনা
কার সাথে তার মিল?

কোন সে নবীর আগমনে
লাজে মরে চাঁদ
সায়্যিদুল আম্বিয়া তিনি
রাসুল মুহাম্মাদ।

সেরা নবী ﷺ
মো. তাইফুর রহমান

সেরা নবী ধরণিতে আগমন করে
শান্তির ফুল ফোটে আমিনার ঘরে।
অসহায় মানুষের মুখে তাই হাসি
বলে সবে নবীজিকে বেশি ভালোবাসি।
নবীজির আগমনে আলোকিত ধরা
অবিচার শেষ হয় কেটে যায় জরা।
প্রিয় নবী শেষ নবী আলামীন নাম
মালিকের বন্ধু সে খুব তার দাম।
প্রিয় নবীর আগমনে খুশি সব লোক
নবীজিকে কাছে পেয়ে নিভে যায় শোক।
দোজাহানের বাদশাহ আমাদের নবী
তুলনা কী হয় তাঁর? নূরের সে ছবি।
হেসেছিল পৃথিবীটা তার আগমনে
উল্লাস করেছিলো পশু-পাখি বনে।
সুখ নামে চারদিকে দূর হয় কালো
আমাদের নবীজিতো ধরণীর আলো।
পৃথিবীতে তার যেই আগমন হয়
সকলের মন থেকে চলে যায় ভয়।
বন্ধ যে হয়ে যায় অন্যায় কাজ
ধরণির বুকে তাই নেমে আসে সাজ।

ভয়ংকরী লাল
মোহাম্মদ নাসির খাঁন

বসন্ত আসতে অনেক দেরি
তবুও কৃষ্ণচূড়ার লালে লাল
পুরো বাংলাদেশ
যেদিকে তাকাই শুধু রক্তরাঙা
যেন সবুজকে গিলে খেতে চাইছে।

গঙ্গা-যমুনায় আবার স্রোত জেগেছে
লাল জলের উত্তাল-পাথাল স্রোত
এ জোয়ারে এবার পাড় ভাঙছে না
ভাঙছে মানুষের হৃদয়

পদ্মার লাল জলে ঢেউ তুলে চলছে
টালমাটাল কালো নৌকা
এ ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হচ্ছে, বেড়েই চলেছে
মাঝি, সাবধানে চালাও—
কখন না তোমার নৌকা ডুবে যায়!
এ ঢেউ বড় ভয়ংকর, বড় আগ্রাসী
এ ঢেউ আঠারো বয়সী যুবকের মত
হার না মানা, অদম্য, উচ্ছল, শৃঙ্খলহীন।
মাঝি, দিশা খুঁজে পাবে?

আযানের কয়েকটি অনন্য তথ্য



যতটুকু সম্ভব আযান মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি শোনা শব্দমালা। প্রচলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মনের সবচেয়ে পরিচিত শব্দমালা আযান। মানুষের জন্মের শুরু থেকে আযানের সাথে তার পরিচয়। সম্প্রতি তুরস্কের পত্রিকা 'যামান' আযান সম্পর্কে কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছে। জেনে নেয়া যাক কয়েকটি তথ্য-

★ আযানের ১ম শব্দ হল 'আল্লাহ' এবং শেষ শব্দও হল 'আল্লাহ'। মনীষীগণ বলেন, এ দিয়ে বুঝানো হয়, আল্লাহ-ই শুরু এবং আল্লাহ-ই শেষ। পবিত্র কুরআনের সূরা হাদীদের ৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার এ বিষয়ে ঘোষণা রয়েছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

★ আযান শব্দটি পবিত্র কুরআনে সর্বমোট রয়েছে ৫ বার। আর আমারা প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করি।

★ আযানের মধ্যে সর্বমোট শব্দ হল ৫০টি। আর আল্লাহ তাআলা মিরাজের সময় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বপ্রথম ৫০ ওয়াক্ত নামায দিয়েছিলেন। পরে তা কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, একজন ব্যাক্তি ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে আল্লাহ তাকে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব দিবেন। অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত মসজিদে গেলে আযানের প্রতিটি শব্দের সমান ওয়াক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে।

★ আযানের মধ্যে সর্বমোট ১৭টি ভিন্ন অক্ষর রয়েছে। আর আমাদের প্রতিদিন ফরয নামায হলো ১৭ রাকাআত। (ফজর ২ + যুহর ৪ + আসর ৪ + মাগরিব ৩ + ইশা ৪) মোট-১৭ রাকাআত।

★ আযানের মধ্যে সবচেয়ে ব্যবহৃত শব্দ হল 'আল্লাহ'। আল্লাহ শব্দের 'আলিফ' অক্ষরটি সম্পূর্ণ আযানে আছে মোট ৪৭ বার, 'লাম' অক্ষরটি ৪৫ বার এবং 'হা' অক্ষরটি ২০ বার সুতরাং, (৪৭+৪৫+২০) মোট- ১১২

আর পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা হলো সূরা ইখলাস। যে সূরায় আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন। আযানের সাথে আল্লাহ তাআলার নিজস্ব পরিচয় জড়িত যা সূরা ইখলাসের সমতূল্য।

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মাদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১২১. ضَامِنٌ (দামিন): বাংলারূপ জামিন। অন্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী, প্রতিভূ, জামিনদার, Bail। যেমন- আসামী জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

১২২. ضَرُوْرٌ (দারুর): বাংলারূপ জরুর। দরকার, আবশ্যক, Necessity।

১২৩. ضَرُوْرِيٌّ (দারুরি): বাংলারূপ জরুরি। প্রয়োজনীয়, আবশ্যকীয়, Emergency। যেমন- জরুরি সভা, জরুরি কাজ, জরুরি কাগজপত্র।

১২৪. ضَبْطٌ (দাবত): বাংলারূপ জপ। মুখস্থ করা, বার বার পড়া, নিয়ন্ত্রণ, Memorize। আরবী জবৃত শব্দ থেকে জপ। যেমন- জপমালা, জপক্লাস।

১২৫. ضَمَانَةٌ (দামানাহ): বাংলারূপ জামানত। নিরাপত্তা, জামিন হিসেবে গচ্ছিত অর্থ/বস্তু, Security। যেমন- নির্বাচনী জামানত, দরপত্র জামানত।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের অনেক নতুন নতুন বিষয় জানার সুযোগ হচ্ছে, আনন্দিত হলাম। আশা করি, পরওয়ানা এভাবে সবসময় আমার জ্ঞানরাজ্যের রাজা হয়ে সাথে থাকবে।

হাসিব হাসান মিরান
দরবেশপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মিপুর

-আন্দালিব ভাই

তুমি ঠিক বলেছো প্রিয় মিরান। পরওয়ানা তোমাদের প্রিয় আবাবীল ফৌজকে আরও সাজাতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য প্রয়োজন তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ। তোমার ভালো লেখাটি এখনই পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজের অনুকূলে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। মনোরম প্রচ্ছদে পরওয়ানা অক্টোবর সংখ্যা মন কেড়েছে। অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি পরওয়ানার মাধ্যমে। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ।

মারিয়া আক্তার
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমার খুশিতে আমরাও খুশি। পরওয়ানা পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাকেও শুভেচ্ছা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি পরওয়ানার নতুন গ্রাহক হয়েছি। অক্টোবর সংখ্যা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। পরওয়ানার মাধ্যমে অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। আবাবীল ফৌজের গল্প, কবিতাসহ সবকিছুই ভালো লাগার মতো। পরওয়ানা হোক সবার জ্ঞান রাজ্যের দীপ্ত মশাল।

আব্দুল কাদির
ব্লু বার্ড স্কুল এণ্ড কলেজ, মিরের ময়দান, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

নতুন গ্রাহক হিসেবে তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই বিভাগ। তোমরা লিখতে পারো যেকোনো বিভাগে। আর তোমাদের লেখার দ্বারাই এগিয়ে যাবে আবাবীল ফৌজ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আবাবীল ফৌজ মাসিক পরওয়ানার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা আমাদের মতো ছোটদের অনেক আনন্দ দেয়। আমি সবসময় যত্ন সহকারে আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো পড়ি। আমাদের জন্য সবসময় এরকম ভালো কিছু উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা করি।

আব্দুল লতিফ সামি
গোবিন্দগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই বিভাগ। তোমাদেরকে আনন্দ দিতে পারায় আমরাও খুশি। পরওয়ানার সাথেই থাকবে, সবসময় নতুন নতুন কিছু পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা আমার প্রিয় একটি ম্যাগাজিন। আমি পরওয়ানার গল্পগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। গতমাসের..... গল্পটি বেশ ভালো লেগেছে। সুন্দর সুন্দর গল্প উপহার দেওয়ার জন্য গল্পকার ও পরওয়ানা পরিবারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সাদিকুর রহমান খান
সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজ
সিলেট সেনানিবাস, সিলেট

আন্দালিব ভাই, পরওয়ানার গল্প তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। তুমিও এরকম সুন্দর সুন্দর গল্প লিখে পাঠাতে পারো আমাদেরকে। তোমার গল্পও ছাঁপা হবে পরবর্তী সংখ্যায়। তোমার জন্য রইলো শুভকামনা।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম

সুপ্রিয় বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই। আশা করি খুব ভালো আছো। তোমাদের পড়ালেখার পাশাপাশি পরওয়ানাকে নিয়মিত পড়ে যাচ্ছো আশা করছি। তোমাদের লেখা যেন অব্যাহত থাকে সবসময়।

তোমাদের শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায় চলছে। দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্লাস মোটামুটি প্রায় সমাপ্তের দিকে। কারো কারো চলছে নির্বাচনি পরীক্ষা। অন্যান্য ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষাও খুবই নিকটে। সে হিসেবে তোমাদের চলছে পড়ালেখার সর্বশেষ প্রস্তুতি। সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ভালো ফলাফলের মাধ্যমে নিশ্চিত হোক তোমাদের ভবিষ্যত ক্যারিয়ার।

আবাবীল বন্ধুরা!

ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। যিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় কবি। প্রথিতযশা এ মহাকবি ৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কবিতার শ্লোকগুলো আজও পুরো বিশ্বকে জাগানিয়া ঝংকারে অনুরণিত করে। আল্লাহ তাআলা যেন এ মহান কবিকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। মহাকবি আল্লামা ইকবালের একটি সুন্দর শ্লোক দিয়েই শেষ করছি আজকের চিঠি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশা করছি। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'চলো আমরা মোমবাতির মতো বাঁচি, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে আলোকিত করি।'

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) কত হিজরীতে ইন্তিকাল করেন?
২. হযরত উমর (রা.) কত হিজরীতে ইন্তিকাল করেন?
৩. ২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশের হার কত?
৪. বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের লেখক কে?
৫. তাতারীদের কোন বাদশাহ প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ৮ রবীউস সানী ৫৬১ হিজরী
২. ৮ম হিজরীতে
৩. সাবা
৪. ৬৩৬
৫. ১৭ সেপ্টেম্বর

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো: রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা,সিলেট # মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম,গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # কামরুল ইসলাম, সঈদপুর বাজার ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা, নবীগঞ্জ # মাহফুজ আল লতিফ,দক্ষিণ মরইরতল প্রাথমিক বিদ্যালয়, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান,সভাপতি, গজনাইপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা।

শব্দকল্প

১	২		৩		৪
৫					
৬			৭	৮	
		৯			
১০				১১	

সূত্র : পাশাপাশি

১। সিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদীসগ্রন্থ ৫। রক্তবর্ণের একটি ফুল ৬। ভগ্নাংশের নিচের অঙ্ক ৭। সিংহাসন ১০। মুসলমানদের জপমালা ১১। দেহ

সূত্র : উপর-নীচ

২। মুসলিমদের প্রথমদিকের একটি যুদ্ধ ৩। ইসলামী বিধান ৪। পূন্য, মর্যাদা ৫। মূল্যবান ধাতু ৮। অলংকৃত, গ্রথিত ৯। পয়গম্বর

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ব্দু	ল	কা	দি	র
র		ট		ক্ষা	হ
বি	ভা	ব	রী		ম
	তি	হ		শ	ত
মা	জা	র		ক্র	

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. নাছির উদ্দিন তালহা

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহফুজ আল লতিফ, দক্ষিণ মরইরতল প্রাথমিক বিদ্যালয়, আটগ্রাম, জকিগন্জ, সিলেট # জাহেদ আহমদ, রসুলপুর জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, চিলাউরা, জগ্ননাথপুর, সুনামগঞ্জ # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার # আশরাফ মাহমুদ সাব্বির, মদমোহন কলেজ, সিলেট # মোঃ জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # কামরুল ইসলাম, নালবহর, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মোঃ মাজিদুর রহমান, তেতইগাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কামলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # শেখ সাব্বির আহমদ, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, নবীগঞ্জ উপজেলা, হবিগঞ্জ # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সামিউল ইসলাম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

সুডোকু

4		1	
	4		1

সমাধানের নিয়ম

এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ২×২ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবার থাকে।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

1	3	2	4
4	2	3	1
3	4	1	2
2	1	4	3

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

আজিম উদ্দিন মাছুম

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান,বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোছা. রাবেয়া রহমান, চৌধুরীগাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট # হুমায়রা সিদ্দীকা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # শেখ সাব্বির আহমদ, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ মাজিদুর রহমান, তেতইগাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কামলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মরিয়ম আক্তার, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো.ছিদ্দিকুর রহমান, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাজহারুল ইসলাম, বাদে ভূকশিমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদরাসা, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

রহস্যময় পান্ডুলিপি



আজ থেকে ১০০ বছর আগে রহস্যময় এই পান্ডুলিপিটি পাওয়া যায়। পোলিশ-আমেরিকান পুস্তক বিক্রেতা প্রত্নতাত্ত্বিক উলফ্রিড ভয়নিখ ১৯১২ সালে এক নিলামের মাধ্যমে এই পান্ডুলিপিটি ক্রয় করেন। উইলফ্রিড ভয়নিখ এর মালিক বিধায় এর নামকরণ হয় ভয়নিখের পান্ডুলিপি।

কিন্তু এর ভিতরের কোন লেখার মর্মার্থ তো দূরের কথা একটি বর্ণও কেউ পড়তে পারেনি। কী নেই এই পান্ডুলিপিটিতে? ফুল,ফল, সংখ্যা, জ্যামিতিক নকশা, গ্রহ, নক্ষত্র, ছবি। এ যেন এক মহা দুর্বোধ্য ধাঁধা। প্রথমদিকে এর লেখক কে তা বের করতেই হিমশিম খেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে বহু চেষ্টা তদবীর করে এর লেখক রজার বেকন এর নাম জানা গেলেও এটাতে তিনি কোন বিষয়ে কী লিখে গেছেন তা জানা যায়নি। কেউ মনে করেন এটাতে তিনি সোনা তৈরীর পদ্ধতি লিখে গেছেন। আবার কেউ মনে করেন এটাতে তিনি আত্মার গোপন রহস্য বলে গেছেন। কারো মতে এটাতে মৃত্যুর ওপারের কথা কিংবা অমরত্বের কথা লেখা আছে ইত্যাদি। কেউ আবার দাবি করেছেন এর চৌদ্দটি বর্ণ তিনি বুঝতে পেরেছেন। কেউ আবার এর দশটি শব্দ বুঝেছেন বলেও দাবি করেছেন। কিন্তু আজ অবধি কেউ এর পরিপূর্ণ মর্ম উদঘাটন করতে সক্ষম হননি। এই পান্ডুলিপিটি মানুষের নিকট অমীমাংসিত রহস্যই রয়ে গেছে।

হাসতে জানি

চাইতে লজ্জা করে!

বাবা ও ছেলে এক চায়ের দোকানের সামনে বসে আছে।
ছেলে : বাবা, ওরা কী খায়?
বাবা : চা।
ছেলে : না, চামু না। চাইতে লজ্জা করে!

পুরো মাঠে টাইলস লাগিয়ে দেবো।

এক নেতা রাস্তা দিয়ে হেটে যেতে একদল কৃষক দেখতে পেলেন।
নেতা: আপনারা কারা?
আপনাদের পায়ে কাদা মাখানো কেন?
কৃষক: আমরা জমিতে চাষবাস করি, কাজ করতে গিয়ে কাদামাখা হয়ে গেছি।
নেতা: নো টেনশন!আগামী নির্বাচনে আমাদের দল ক্ষমতায় গেলে আপনাদের পুরো মাঠে টাইলস লাগিয়ে দেবো।

গ্রন্থনা: রাফিয়া আক্তার
মেহেরুন্নেছা গার্লস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ,৫৪/১ নর্থ সার্কুলার রোড, আকলিমাবাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা

আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৪৮২. আবিদ মাহমুদ লবিব
পিতা: মাওলানা পিয়ার মাহমুদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেখ হাবীব উল্লাহ মাস্টার দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: পুরান সিরাজপুর
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৪৮৩. জাবের আহমদ
পিতা: নিজাম উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: বাল্লা
ডাক: ইছামতি
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৮৪. সাদিয়া জান্নাত উর্মি
পিতা: সেলিম আহমদ কাওছার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমি
গ্রাম: ঘাটপার
ডাক: চরমহল্লাবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৮৫. রফিক আহমদ সালমান
পিতা: মো. শফিকুন নূর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: এসপিপিএম দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বাঁশখলা
ডাক: পেপার মিলস
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৮৬. মাহবুব আলম
পিতা: আব্দুল মান্নান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা
গ্রাম: উযান মেহেরপুর
ডাক: দরগাহ বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৮৭. মাহবুবা রহমান সিদ্দিকা
পিতা: মাওলানা শুয়াইবুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: পূর্বরেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: পূর্ব মদনগৌরি
ডাক: ইলাইগঞ্জ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৮৮. আবু সুফিয়ান সাদি
পিতা: আছার উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: চৌঘরী
ডাক: গোলাপগঞ্জ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৮৯. নাদিয়া জান্নাত প্রমি
পিতা: সেলিম আহমদ কাওছার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমি
গ্রাম: ঘাটপার
ডাক: চরমহল্লাবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৯০. সাইমুম তাজওয়ার তাহমিদ
পিতা: মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: জামেয়া বাইতুল কুরআন মাদরাসা
গ্রাম: ষোলঘর
ডাক: সুনামগঞ্জ
থানা: সুনামগঞ্জ
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৯১. নুযহাত সিদ্দিকা তাবসসুম
পিতা: মোহাম্মদ জাহির উদ্দিন
গ্রাম: সাতপারা
ডাক: সোনালী বাংলাবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالى داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীদ্বারা সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দ্বীনি শিক্ষার অন্যন্য প্রতিষ্ঠান

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

আলিয়া ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।

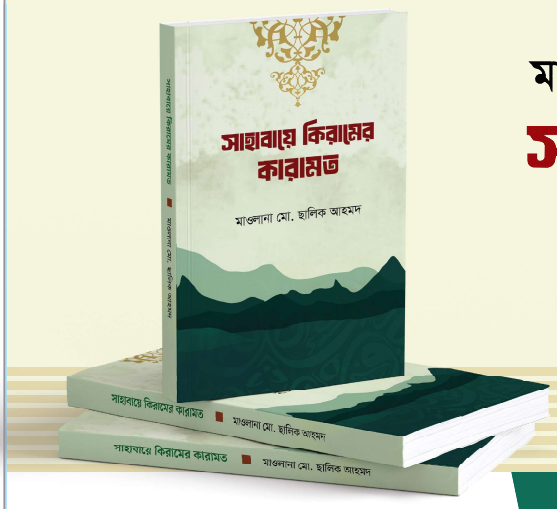
সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।

ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072, 01712-904501, 01737-769053



শায়খুল হাদীস

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) রচিত

সাহাবায়ে কিরামের কারামত

প্রকাশিত হয়েছে

আপনার কপি সংগ্রহ করুন

নাহজুছ ছালিক

ভূরকী পীর বাড়ী, ভূরকী বাজার (৩০৮৩)
বিশ্বনাথ, সিলেট
01716969061
nahjussalik@gmail.com

সার্বিক যোগাযোগ: ০১৭১২-৮৯১৭৭৯

প্রাপ্তিস্থান

নোমানিয়া লাইব্রেরি
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দরবাজার, সিলেট

লতিফিয়া লাইব্রেরি
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দরবাজার, সিলেট

সাইমুন লাইব্রেরি
সোবহানীঘাট, সিলেট

রাহবার লাইব্রেরি
সোবহানীঘাট, সিলেট

লতিফিয়া লাইব্রেরি
লামাকাজী (বিশ্বনাথ রোড)
বিশ্বনাথ, সিলেট

আপনি কি ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

আল মারওয়ান ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস্

হজ্জ লাইসেন্স নং-১৫১২

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট

ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-২৫৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলমান

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

ATAB

ওমরাহ্ ইকোনমি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ থেকে ৫-১০ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মসজিদ-এ নববী থেকে ৫-৭ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ওমরাহ্ ভি.আই.পি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ ও মসজিদ-এ নববীর নিকটবর্তী ৪স্টার/৫স্টার হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ভারত এবং বাংলাদেশের যেকোনো এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন (Domestic) টিকেট পাওয়া যায়।

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিস
- সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং
- এয়ার টিকেট
- সৌদি আরবে নিজস্ব মোয়াল্লেম দ্বারা হজ্জ-ওমরাহ্ পরিচালনা করা
- প্রয়োজনে হুইল চেয়ারে যাত্রী বহন
- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান

রশিদ এম্পোরিয়াম (২য় তলা), দরগাহ গেইট, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৩৭৮১৫৫৮০, ০১৬১১৪৮০৪৮০, ০১৭৪৭৫১৫১৫১

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর

LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

বৈশিষ্ঠাবলী

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১১ বছর

ভর্তি চলছে

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

প্রতিবছর

- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ

মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

বৈশিষ্ট্য:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TAAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬১ লতিফ ট্রাভেলস স্থাপিত : ১৯৬২

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

- এয়ার টিকেট
- প্যাকেজ ট্যুর
- ম্যানপাওয়ার
- ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

নকশি

এক্সক্লুসিভ কালেকশন

আর এম সিটি শপিং মল
কুলাউড়া
Nakshi Exclusive

মেসার্স
হাজী আলাউদ্দিন ট্রেডার্স



উত্তর বাজার, কুলাউড়া

মাথা



কুলাউড়া শপিং কমপ্লেক্স (নিচতলা)
কুলাউড়া

প্রোঃ আফজাল হোসেন সাজু ০১৭৪৪-৮১৫০৬৯

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

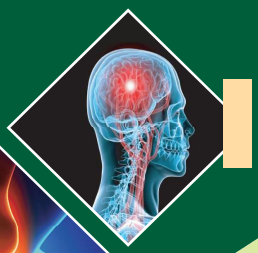
- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে









- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127